পুরোগামী বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বৈশাখ-চৈত্র ১৪২২
১৪ই এপ্রিল, ২০১৬
ত্রিংশতি বর্ষ : প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
ঢাকা

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা

পুরোগামী বিজ্ঞান

ত্রিংশতি বর্ষ : প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা
বৈশাখ-চৈত্র, ১৪২২
১৪ই এপ্রিল, ২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা : মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিসিএসআইআর, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

আহ্বায়ক : মোঃ মনছুর রাজা চৌধুরী, সদস্য (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)

সদস্য : ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ
: ড. সামিনা আহ্‌মেদ
: মুহাম্মদ শাহরিয়ার বাসার
: লিটন চন্দ্র মহন্ত

সম্পাদক : মোঃ ইছাহাক মোল্লা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় : মোঃ ইছাহাক মোল্লা

মূল্য : ১৫.০০ (পনের টাকা)

মুদ্রণে : জলসিঁড়ি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৬২ ফকিরাপুল, ঢাকা,
মোবাইল: ০১৭১৫ ৩০৫ ৩৭১।

PUROGAMI BIGGYAN : Quarterly Science Journal, 30th years 1-4th Vol. Editor : Md, Ishak Molla, Published by Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Dr. Qudrat-i-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh. Price : Taka Fifteen only. US Dollar : One and Half only.

পুরোগামী বিজ্ঞান

বাংলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ ''পুরোগামী বিজ্ঞান" -এ প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখক-সম্মানী দেয়া হয়। প্রবন্ধে প্রকাশিত তথ্য ও মতামতের দায়িত্ব লেখকের।

প্রবন্ধের শিরোনামের ডান কোণায় ''শুধু পুরোগামী বিজ্ঞান-এ ছাপানোর জন্য'' একথা স্পষ্ট করে লেখা বাঞ্ছনীয়।

লেখা ফুলস্-ক্যাপ সাইজে সাদা কাগজের এক পিঠে লিখতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ বা সুস্পষ্ট হাতে লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধ সহজবোধ্য করার জন্য ফটো কিংবা ট্রেসিং কাগজে হাতে আঁকা ছবি ব্যবহার করলে ভালো হয় এ ছাড়া কম্পিউটারে ব্যবহার উপযোগী সফ্ট কপি প্রেরণ করা যাবে। ছবি পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং আলাদা কাগজে ক্যাপসনসহ পাঠাতে হবে। প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতীক এবং অন্যান্য সূত্র ট্রেসিং কাগজে সর্বাধিক পাঁচ ইঞ্চির ভিতর স্পষ্টভাবে পাঠাতে হবে।

কোন প্রবন্ধ ও লেখা পত্রিকায় ছাপানোর অযোগ্য হলে তা ফেরত দেওয়া হয় না। সব সময় কম ডাক খরচে পত্রিকা পাঠানো হয়। রেজিস্ট্রি ডাকে পত্রিকা পেতে হলে সেই খরচ গ্রাহককেই বহন করতে হবে।

প্রবন্ধকার প্রবন্ধের সাথে নিজের সংক্ষিপ্ত পেশাগত পরিচয়সহ ঠিকানা পাঠাবেন। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকের অধিকার থাকবে।

সাধারণত প্রতি তিন মাস অন্তর পুরোগামী বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য পনের টাকা। ডাক মাশুল আলাদা। এজেন্টদের জন্য কমিশন ৩০%। ১০ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। ভিপিযোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

প্রবন্ধে লিখিত মতামত ও তথ্য সম্পূর্ণই প্রবন্ধকারের। এ সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পাদক দায়ী নয়।

যোগাযোগ

মোঃ ইছাহাক মোল্লা
সম্পাদক
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা
ডঃ কুদরাত-এ-খুদা সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। ফোন : ৯৬৭১৬১৭,
E-mail : ishakpro@yahoo.com, web : www.bcsir.gov.bd

পুরোগামী বিজ্ঞান

বৈশাখ-চৈত্র ১৪২২
১৪ই এপ্রিল, ২০১৬
ত্রিংশতি বর্ষ : প্রথম থেকে চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

০১।	এই মহাবিশ্ব কতটা অনন্য?	: অধ্যাপক ড. আলী আসগর	৫
০২।	ক্রোমিয়াম বিষাক্ততা	: অধ্যাপক ড. নিশীথ কুমার পাল	১৩
০৩।	খাদ্যে আঁশের গুরুত্ব	: অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভুইয়া	১৬
০৪।	বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি	: মোস্তাফা জব্বার	২০
০৫।	মানবদেহে পানি	: ড. মুহম্মদ কবিরউল্যা	২৯
০৬।	বাংলাদেশের মিঠা ও লোনা পানির কচ্ছপ প্রজাতি	: ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ	৩৪
০৭।	মানবদেহে অ্যামিনো অ্যাসিডের গুরুত	: এম এ ওহাব	৩৮
০৮।	ক্ষুধা কি? ক্ষুধা ও অপুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী?	: মোকাররম বিল্লাহ চৌধুরী	৪১
০৯।	বাংলাদেশের সংবেদনশীল উপকূলাঞ্চল	: ড. অরুণ কুমার লাহিড়ী	৪৭
১০।	আর্সেনিক ও আর্সেনিকের ব্যবহার	: অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬
১১।	বহুল আলোচিত তিন মহাজাগতিক মহাকাব্যের, (তিন রূপকার)	: শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী	৭১
১২।	নিউটনীয় অভিকর্ষের কারণ আবিষ্কার	: ডাঃ মোঃ আক্কাস উদ্দীন (মেহেদী)	৭৪
১৩।	অ্যালকেমিস্ট্রি ও কিছু অ্যালকিমীয় চিহ্ন এবং প্রতীক	: সৌমেন সাহা	৮৩
১৪।	বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ	: মুহা: ওবায়দুল হক হেলালী	৯২
১৫।	অনন্য নক্ষত্র মানব: এ পি জে আবদুল কালাম	: লিটন চন্দ্র মহন্ত	১০৪
১৬।	বাংলাদেশে খরার প্রভাব	: শাহনাজ বেগম	১০৯
১৭।	সাংস্কৃতিক সম্পদ ক্ষয়সাধন এর কারনসমুহ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা	: মোঃ শহিদুল ইসলাম	১১৩

এই মহাবিশ্ব কতটা অনন্য?

অধ্যাপক ড. আলী আসগর

বড় মাপে দেখলে মহাবিশ্বকে অত্যন্ত সরল মনে হয়। কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী, এর বিচিত্র জীবজগৎ, জীবজগতের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল যে ভৌত পরিবেশ সবই অত্যন্ত জটিল। গড় হিসাবে মহাবিশ্ব প্রায় বস্তুহীন শীতল এক শূন্যতা, যা এক মৃদু তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের দ্বারা আবৃত। এর পটভূমির উষ্ণতা হলো পরম শূন্য তাপমাত্রায় মাত্র তিন ডিগ্রি অর্থাৎ বরফের চেয়ে ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিচে। অথচ আমরা বাস করি এমন একটি গ্রহে যা জটিল ও বিচিত্র। জীবনের উদ্ভব, বিকাশ ও স্থিতির জন্য সঠিক তাপ ও আলো প্রাপ্ত। এই আলো আর তাপ আসছে সূর্য থেকে ঠিক পরিমিত রূপে। স্বভাবতই আমাদের আবাসস্থান–এই পৃথিবী নামক অত্যন্ত বিশেষ এ গ্রহে।

আর একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবলে আমরা দেখব– আমরা এই যে বেঁচে আছি জীবনের উদ্ভাস ও চেতনা নিয়ে সেটাও বিপুল কালের মধ্যে অনন্য ও বিশেষ। মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তে যে প্রচন্ড তাপ, চাপ ও বিকিরণের আধিপত্য ছিল তা দীর্ঘ সময় নিয়েছে জীবনের উদ্ভবের যথাযোগ্য মাত্রায় পৌঁছাতে। ভবিষ্যতে সম্ভবত ভৌত পরিবেশ আবার প্রতিকূল হয়ে উঠবে। এই গ্রহে জীবনধারণের পক্ষে, যদি জীবনের ধারা এমনটিই থাকে এখন যেমন আছে। আমরা দেখব, আমরা এখন এখানে পৃথিবীতে যে বেঁচে আছি চেতনা নিয়ে, তার মূলে প্রকৃতির মৌলিক বলগুলোর এবং বস্তু কণিকাসমূহের এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য কাজ করছে। একে ভিত্তি করে নানা প্রশ্ন ও বিস্ময়ের মুখোমুখি হই আমরা।

যেমন, নক্ষত্রগুলো এত বিশাল কেন? আমাদের দেহের আকারই বা আরো বড় না কেন? আম পাকলে তা গাছ থেকে ঝরে পড়ে কিন্তু কাঁচা অবস্থায় তা ঝুলে থাকে কেমন করে? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলেও আমরা দেখব সেখানে কাজ করছে বস্তুর ভরের জন্য যে অভিকর্ষ বল এবং বস্তুর বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য যে তড়িৎ-চুম্বক বল এদের মধ্যেকার সম্পর্ক সূক্ষ্মভাবে কাজ করছে।

দুটো প্রোটনের মধ্যে যে মহাকর্ষ বল কাজ করে এদের ভরের জন্য এবং এদের মধ্যে যে বৈদ্যুতিক বিবর্তন বল কাজ করে এদের বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য, তার অনুপাত অত্যন্ত ছোট। অভিকর্ষ বলকে আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক বল দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যা আমরা পাই তা হলো $১০^{-৩৬}$। অর্থাৎ এদের অনুপাত পেতে ১ কে ভাগ করতে হবে ১–এর পর ছত্রিশটি শূন্য

বসিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা দিয়ে। পারমাণবিক স্কেলে অভিকর্ষ বলের প্রভাবকে আমরা তাই সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক পরমাণু যখন একত্রে কাজ করে তখন এই অভিকর্ষ বল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

একটি স্বাভাবিক পরমাণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ সমান পরিমাণে থাকে বলে সার্বিকভাবে পরমাণু চার্জ শূন্য থাকে। একটি বড় বস্তুতে তাই বৈদ্যুতিক চার্জ আমরা সাধারণত দেখতে পাই না, সেই কারণে বৈদ্যুতিক বলও। শুধু দুর্বল মহাকর্ষ বল সেখানে কার্যকর এর ভরের জন্য।

একটি আম যখন গাছের ডালে ঝুলে থাকে, এর বোঁটায় খুব স্থানীয়ভাবে বৈদ্যুতিক বল কাজ করে এর অনুবন্ধন। কারণ এখানে দুই বৈদ্যুতিক চার্জের মধ্যে দূরত্বের পার্থক্যের জন্য এদের প্রভাব বলের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আমটি পৃথিবীর দিকে যখন পড়ে তখন পৃথিবীর কোনো বৈদ্যুতিক বল এর ওপর কাজ করে না। বরং পৃথিবীর সমস্ত বস্তু কণিকার মিলিত অভিকর্ষ বল কাজ করে আমের ভরের ওপরে। আম যখন পেকে যায় তখন আমের বোঁটায় যে বৈদ্যুতিক বল তা পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে আমকে আর ধরে রাখতে পারে না।

এই অভিকর্ষ বল ও তড়িৎ-চুম্বক বল ছাড়াও আরো দুটি মৌলিক বল আছে প্রকৃতিতে। এরা হলো প্রবল নিউক্লীয় বল ও দুর্বল নিউক্লীয় বল। অবশ্য সম্প্রতি দুর্বল নিউক্লীয় বল ও তড়িৎ-চুম্বক বলকে একীভূত করা হয়েছে। যদি আমরা এই চারটি মৌলিক বলের তুলনামূলক তীব্রতা যাচাই করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এদের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি ভারসাম্য বিশ্বে সমস্ত ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই সঙ্গে এই পৃথিবীতে আমাদের আবির্ভাব ও অবস্থিতি।

নক্ষত্র জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করল। তাত্ত্বিকভাবে এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো যে, অভিকর্ষের জন্য কোনো নক্ষত্রে কি ফিউশন বিক্রিয়া ঘটতে পারে? পরমাণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ সমান পরিমাণে উপস্থিত থাকাতে এদের প্রভাব কাটাকাটি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভরের বেলাতে এর প্রভাব ক্রমাগত যোগ হতে থাকে। ফলে অভিকর্ষ বল যতই দুর্বল হোক বস্তুর ভর বৃদ্ধি পাবার ফলে এর মিলিত প্রভাব কি কোনো এক স্তরে তড়িৎ বলকে ছাড়িয়ে যেতে পারে?

ফিউশন ঘটাবার জন্য প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের যে বৈদ্যুতিক বিবর্তন তা অতিক্রম করার মতন বাহ্যিক চাপ সৃষ্টি হতে হবে, যাতে এদের মধ্যে দূরত্ব এতটা কমে যায় যে, অতি ক্ষুদ্র দূরত্বে সক্রিয় নিউক্লীয় বল এদের আকৃষ্ট করে ভারী নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করতে পারে। কোনো বস্তুপিন্ডে এটা ঘটতে হলে কতটা বড় হতে হবে সেই বস্তু? অর্থাৎ কতটা ভারী হতে হবে?

মনে করা যাক আমরা বস্তুর ভর পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বাড়াবার জন্য প্রথমে ১০টি অণু, এরপর ১০০টি অণু, এরপর ১০০০, এমনি করে অণুর সমাবেশ ঘটাতে থাকলাম। এভাবে অগ্রসর হলে ২৪তম বস্তুটি হবে একটি এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের একটি চিনির কিউব। কারণ, এতে থাকবে ১০২৪ অর্থাৎ ১– এরপর ২৪টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায় ততটি

পরমাণু। ৩৯তম বস্তুটি হবে এক কিলোমিটার বিস্তৃত একটি পাহাড়ের মতন। আমরা ভাবতে পারি যে, অভিকর্ষ বল যেহেতু তড়িৎ বলের তুলনায় ১০৩৬ গুণ দুর্বল তাই ৩৬তম বস্তুটির বেলায় মহাকর্ষ বল তড়িৎ বলকে ধরে ফেলবে। আসলে আমাদের অনেক বেশি অগ্রসর হতে হবে। কারণ মহাকর্ষ বল নির্ভর করে ভর ও দূরত্বের অনুপাতের ওপরে। কিন্তু ভর M ও ব্যাসার্ধ R এর মধ্যে সম্পর্ক হলো, M হচ্ছে = R এর আনুপাতিক।

সুতরাং অভিকর্ষ বল M১/৩ + R২/৩ এর অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অভিকর্ষ বলকে ১০৩৬ গুণ বৃদ্ধি করতে হলে ভর বৃদ্ধি করতে হবে ১০৫৪ গুণ। যেহেতু (১০৫৪)২/৩=১০৩৬।

আমরা দেখতে পেলাম প্রোটনের সংখ্যা অর্থাৎ হাইড্রোজেনের মতন পরমাণুর সংখ্যা যখন ১০৫৪ হবে, তখন পরমাণুগুলো অভিকর্ষ বলের চাপে ভেঙে পড়তে থাকবে। কোনো নক্ষত্রে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু হতে হলে এর ভর যে প্রচন্ড হতে হবে তার কারণ হলো অভিকর্ষ বল তড়িৎ –চুম্বক বলের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল। এর ওপরে ভিত্তি করে একজন পদার্থবিজ্ঞানী নীতিগতভাবে হিসাব করতে পারেন একটি নক্ষত্রের জীবনচক্র কেমন হবে। বস্তুত ১৯২০- এর দিকে স্যার এডিংটন দেখিয়েছেন যে, সহস্র লক্ষ গ্যাসের পিন্ড যে নক্ষত্ররূপে আকাশে অবস্থান করছে তার মূলে রয়েছে অভিকর্ষ বল ও তড়িৎ বলের এই সম্পর্ক।

আসলে একটি নক্ষত্রে ভর ১০৫৭ প্রোটনের ভরের সমান হলেই মাত্র নিউক্লিয়ার ফিউশন শুরু হতে পারে। কারণ উত্তপ্ত নক্ষত্রের গ্যাসীয় অবস্থায় পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেক্ট্রনগুলো ছোটাছুটি করে। এদেরকে একত্রে ধরে রাখে অভিকর্ষ বল এবং এই বলের প্রভাবেই হালকা পরমাণুর নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে ভারী নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে এবং প্রচন্ড তাপ সৃষ্টি করে। যদি অভিকর্ষ বল আরো দুর্বল হতো, নক্ষত্রের আকার আরো বড় হতো। এবং অভিকর্ষ বল যদি আরো প্রবল হতো নক্ষত্রের আকার হতো আরো ছোট এবং এদের জীবনচক্র দ্রুত শেষ হয়ে যেত। সম্ভবত এত দ্রুত এসব নক্ষত্র নিঃশেষিত হয়ে যেত তাপ আর আলো বিকিরণ করে যে, বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হতো না এর কোনো গ্রহে। প্রাকৃতিক মৌলিক বলগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক পৃথিবীতে আমাদের দেহের মাপও নির্ধারণ করেছে। আমাদের শরীরের প্রত্যঙ্গগুলো তড়িৎ বল দ্বারা যুক্ত হয়ে আছে অনুবন্ধনে। সহজ হিসাব থেকেই দেখানো যায় যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা বৃক্ষে বাস করার ফলে তাদের দেহের মাপ আমাদের বর্তমান দেহের মাপের চেয়ে বেশি ভিন্ন হতে পারত না। কারণ দেহের মাপ বেশি বড় হলে বৃক্ষ থেকে কোনো পতন তাদের দেহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলত। অভিকর্ষ বলের সঙ্গে তড়িৎ বলের ভারসাম্য রক্ষা করেই দেহের স্থিতিশীল আকার আমরা অর্জন করেছি।

আমাদের অস্তিত্বের জন্য এমন আরো অনেক সমাবর্তন আমরা দেখতে পাই মহাজাগতিক ঘটনামালার। যেমন, নিউক্লীয় বল- যা নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে। যদি এই বল আরো একটু প্রবলতর হতো বর্তমানের চেয়ে, তড়িৎ বলের সঙ্গে এর

তুলনামূলক বিচারে, তাহলে দুটো প্রোটন এদের মধ্যেকার কুলাম বিকর্ষণ অতিক্রম করে নিউক্লীয় বলে আবদ্ধ হতে পারত। দ্বি-প্রোটন নিউক্লিয়াস তখন স্থিতিলাভ করত। কিন্তু তা যে ঘটে না এখন তার কারণ, চার্জহীন নিউট্রন কণিকার উপস্থিতি ছাড়া প্রোটনে সঙ্গে প্রোটনের কুলাম বিকর্ষণ এদের মধ্যেকার নিউক্লীয় আকর্ষণকে ছাড়িয়ে যায়। এক বা একাধিক নিউট্রনের উপস্থিতিই মাত্র নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লীয় আকর্ষণ বলকে বৃদ্ধি করে, কুলাম বিকর্ষণকে বৃদ্ধি না করে। ফলে নক্ষত্রের মধ্যে ভারী সব নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়।

দ্বি-প্রোটন নিউক্লিয়াস যদি স্থিতিশীলভাবে তৈরি হতে পারত, তাহলে মহাবিশ্বের উপাদান যেত বদলে। জটিল সব পরমাণু তৈরি হতো না সে ক্ষেত্রে, এবং সেই কারণে জটিল নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটত না নক্ষত্রে প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন করে। ফলে, জটিল সব বস্তুগত গঠন ও জীবনের উদ্ভব ও সম্ভব হতো না। অন্য দিকে নিউক্লীয় বল যদি বর্তমানের তুলনায় আরো একটু দুর্বল হতো, মহাবিশ্বে শুধু সরলতম অণু হাইড্রোজেন থাকত। হাইড্রোজেন ও আদি পরমাণু হিলিয়াম ছাড়া, সমস্ত জটিল পরমাণুই উৎপন্ন হয়েছে নক্ষত্রের মধ্যে। লোহা, কার্বন, অক্সিজেন-এসবই নক্ষত্রের মধ্যে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে। সেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে যে ধ্বংসাবশেষ ধূলিমেঘ সৃষ্টি করেছিল আমাদের সূর্য এবং পৃথিবী সেই উপাদান থেকে গঠিত হয়েছে।

অনেকগুলো আকস্মিক ঘটনার সমাবর্তন সম্ভব করেছে আমাদের অনন্য জীবন এই বিশ্বে। প্রকৃতির নিয়মগুলোকে একটু রদবদল করে আমরা ভিন্ন এক বিশ্বের কথা ভাবতে পারি যেখানে প্রাকৃতিক বলগুলোর মধ্যে সম্পর্ক হতো ভিন্ন। কিন্তু সেই বিশ্ব হতো নিষ্ফলা-জীবনহীন, জটিলতাহীন ও অনাকর্ষণীয়।

বস্তুঃ আজকের গবেষণা ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তি: জন রাস্কিন বলেছিলেন–পুরনো রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এমন কোন নীতি বা নিয়ম নেই যা নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বা নতুন বস্তুর উদ্ভাবনের ফলে এক মুহূর্তে বদলে যেতে পারে না। বস্তুত সভ্যতার উদ্ভবের নতুন সব বস্তুর উদ্ভাবনের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন, গভীর ও সুদূরপ্রসারী। প্রতিকূল পরিবেশ ও ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানুষের যে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রকাশ তার মূলে রয়েছে মানুষের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা-নতুন বস্তুকে নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের আমাদের ভবিষ্যৎ কৃৎকৌশল ও প্রযুক্তিগত সভ্যতার মান ও বিস্তার বহুলাংশে নির্ধারিত হবে, নির্মাণ কাজে কী ধরনের বস্তু আকারে আয়ত্তে আসবে তখন, ব্যবহৃত বস্তুর গুণ কতটা রূপান্তর ও বিকাশ লাভ করবে, কী বৈশিষ্ট্যের নতুন বস্তু উদ্ভাবিত হবে তা গবেষণার ভিতর দিয়ে-এসব কিছুর দ্বারা। যেমন-রকেট নির্মাণের জন্যে ব্যবহৃত সংকর ধাতুর দৃঢ়তা অর্থাৎ তাপ সহ্য করবার ক্ষমতা যদি মাত্র শতকরা দশ কিংবা পনের ভাগ কম হতো, তা হলে চাঁদে মানুষ পাঠাবার আয়োজন অন্য সব দিক থেকে সম্পন্ন করার পরও ব্যর্থ হয়ে যেত। অভিনব সব বস্তু বিস্ময়কর নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে উদ্ভাবিত হয়েছে কখনো মৌলিক গবেষণা, বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বিকাশের ধারায়। আবার কখনো শিল্প ও প্রযুক্তির বাহ্যিক প্রয়োজনে।

আমরা লক্ষ করব প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর এবং গভীরতর নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর ও গভীরতার রূপে উদঘাটনের ভিতর দিয়ে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন ও নির্মাণ বস্তুর গুণগত

বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন মানুষের নিয়ন্ত্রণসাধ্য হয়ে উঠছে বর্ধিত হারে। প্রতিটি মৌলিক আবিষ্কার বস্তুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে নতুন স্বাধীনতা দেয়, নতুন ভাবে সীমানা নির্ধারণ করে আকাঙ্খিত বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি করতে ও নতুন ধরনের বস্তু উদ্ভাবনে বস্তু বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি ঘটছে ভিতর থেকে অনুসন্ধিৎসা, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত বিকাশের ধারা ও বিজ্ঞানীর সৌন্দর্য চেতনায়। এ ছাড়া বাইরের একটি প্রভাব ও কাজ করছে বস্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে, তা হলো নতুন যন্ত্র নির্মাণ, শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ বস্তুর চাহিদা, প্রচলিত বস্তুর দুর্মূল্য এমন কি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। কিন্তু এই বাহ্যিক কারণ গুলো অনেকটা স্থুল। ফলে বস্তুর মধ্যে অসাধারণ গুণ সৃষ্টি বা অভিনব কোন বস্তুর উদ্ভাবনের এই বাহ্যিক কারণগুলো কাজ করলেও অতোটা শক্তিশালী নয়। মোট কথা বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সূক্ষ্ম ও গভীর সৃষ্টিশীলতার ফসল। এখানে অনিশ্চয়তা আছে, একটি সম্ভাবনার নিয়ম আছে। শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন-বোধ থেকে বা লাভ ক্ষতির যান্ত্রিক হিসাব গবেষণার পরিকল্পনা বড় ধরনের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সহায়ক নয়। অন্য দিকে একটি প্রস্তুত মনও একটি সচেতন সমাজই মাত্র একটি আকস্মিক আবিষ্কারের সুফলকে কাজে লাগাতে সক্ষম।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বস্তু গবেষণার দীর্ঘসূত্রী অথচ অনিবার্য ও গভীর প্রভাবকে মোটামুটিভাবে দেখতে পারি। এখন যে সব বস্তুর উন্নয়ন হবে গবেষণা চলছে, আগামী দশকে তা হয়তো ব্যবহৃত হতে শুরু করবে প্রযুক্তিতে, এখন যা মৌলিক গবেষণার বিষয় এবং যেসব বস্তু ও তাদের গুণাগুণ নিয়ে তাত্ত্বিক জল্পনা কল্পনা চলছে তা হয়তো আগামী দশকে মৌলিক পরীক্ষামূলক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠবে। অন্য দিকে আজকে যা প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভবনা অর্থনৈতিক ভাবে গুণযোগ্য হয়ে উঠতে হয়তো এক দশক সময় নিয়ে নেবে। প্রযুক্তি তাই এক গতিশীল ধারণা, প্রবাহিত নদীর স্রোতের মতন। যাকে আমরা একই নদী বলে চিহ্নিত করছি তার ভিতর বস্তু স্থির হয়ে নেই। এর ব্যবহারযোগ্য পানি বরফগলা পাহাড়ের উৎস থেকে এসে চলে যাচ্ছে, পানির মতই এর প্রবাহ তা নাই। প্রবাহমান তা নতুন জ্ঞানের, ধারণা সৃষ্টির। প্রকৃতির ঘটনামালার পর্যবেক্ষণ ও বিশেষণের ভিতর দিয়ে বস্তু জগতের নিয়মগুলো গভীরতর দৃষ্টিতে অবতরণ এবং তার প্রয়োগে বস্তুর মধ্যে নতুন গুণ সৃষ্টি, বস্তুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ও অভিনব বৈশিষ্ট্যের নতুন বস্তুর উদ্ভাবন। প্রযুক্তির বিকাশ মানবতার উৎস এই নতুন জ্ঞান সৃষ্টি গবেষণাগারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সৃজনশীলন ভাবনা, বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও কৌশল উদ্ভাবনের স্বাধীন আবহে। এই জন্যেই প্রযুক্তির হস্তান্তর বলে এমন কিছু নেই যেখানে কতকগুলো যন্ত্র, প্রচলিত কৌশল বা নির্দিষ্ট প্রয়োগিক জ্ঞানকে ধার করে এনে প্রযুক্তির পরিবৃত্তি ঘটানো সম্ভব। যেমন, ধার করা পানিতে সম্ভব নয় সচল নদী সৃষ্টি। প্রফেসর আব্দুস সালামের ভাষায় প্রযুক্তির স্থানান্তর সম্ভাবনায় আনুষাঙ্গিক বিজ্ঞানের স্থানান্তরকরণ ছাড়া। বস্তুত প্রফেসর সালামের কথাটি বিপরীত অর্থেও সত্য। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সুপার কনডাকটিং, সুপার কলাইডর, যেখানে চল্লিশ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিকে দুই কণিকার মধ্যে সংঘর্ষ ঘটাবার কল্পনা চলছে এবং যেখানে ছয় বিলিয়ন ডলার খরচ হবে, সবই গভীর ভাবে প্রযুক্তি নির্ভর। যদিও এগুলো মৌলিক গবেষণার যন্ত্র।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে এই উপলব্ধি আরো একটি কারণে প্রয়োজন। আগামী দিনের প্রযুক্তি গভীরতর রূপে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন এবং তাতে অভিনব সব বৈশিষ্ট্য সংযোজনের উপরে। সীমাহীন সেই অগ্রযাত্রায় উন্নয়নকামীদেশ হিসেবে আমরাও যদি অংশ নিতে চাই তা হলে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির অপরিহার্য রূপে বস্তু গবেষণায় আমাদের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা ও গবেষণায় ভৌত পরিবেশ সৃষ্টির কাজটি বিজ্ঞানীরা একভাবে নিতে পারে না। প্রয়োজন ব্যতীত চেতনা ও উপলব্ধি সৃষ্টির। বিজ্ঞান বিষয়ক এই বক্তৃতামালা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

আমরা যদি পেছন দিকে তাকাই তা হলে লক্ষ্য করবো যে, মানব সভ্যতার দীর্ঘতম অংশই অগ্রসর হয়েছে অন্ধ পরীক্ষা নিরীক্ষা ভিতর দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এবং কখনো কখনো অনুপ্রাণিত অনুমানকে সম্ভব করে। মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ ভাবে সত্য। পাথর, কাঠ মাটি, পশুর অস্থি ও চামড়াই ছিলো প্রকৃতি থেকে পাওয়া নির্মাণ বস্তু, আদিম মানুষের। খৃষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে যে, কাঁদা মাটিকে পুড়িয়ে শক্ত পাত্র তৈরি করা সম্ভব। এরও সাত হাজার বছর পর গ্রীক দার্শনিকরা অনুমান করলো বস্তুর মূল গঠন কার্য হলো মৌলিক কিছু নির্দিষ্ট পদার্থ। যদিও নির্মাণ বস্তুর সন্ধান, নির্বাচন, রূপান্তর-এসবই ছিলো সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারা কিন্তু তা ছিলো কৃতকৌশলের ব্যাপার ও অন্ধ পরীক্ষা নিরীক্ষার। কোনো বস্তু শক্ত, কোনটি ভঙ্গুর, কোনটি দাহ্য ও ও কোনটি অদাহ্য, কিভাবে ঘষে বা পুড়িয়ে কোন বস্তুকে অস্ত্র বা হাতিয়ার বানাতে হবে–এসব কৌশল ও দক্ষতা মানুষ অর্জন করলেও, বস্তুর মৌলিক গুণাগুণ কী এবং বিশেষ সব গুণের জন্য মূল কারণ কি তা তারা জানতে চাইতো না। বস্তুতঃ সেটা সম্ভবও ছিল না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সেই স্তরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাত্র রসায়ন বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা অটিজানিদের উদ্ভবিত বস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে কিছুটা অনুমানভিত্তিক তত্ত্ব উপস্থিত করতে থাকেন। এই শতাব্দীতে এবং সেটাও বিশেষ করে এর শেষ অর্ধেক, বিজ্ঞানের নতুন সব তত্ত্বও পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, বস্তুর বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ভৌত নিয়মগুলো আবিষ্কারের সাহায্য করতে শুরু করেছে। এর ফলে বিজ্ঞানীরা এখন বলতে পারে কোন বস্তু কেন শক্ত এবং কোন বস্তু কেন ভঙ্গুর। কোনটি বিদ্যুৎ পরিবাহী এবং কোনটি অপরিবাহী কেন? কাঁচ কেন স্বচ্ছ অথচ ধাতব সবই অস্বচ্ছ কেন? চুম্বকত্বের মূল উৎস কী? উচ্চ তাপমাত্রার লোহা এর চুম্বকত্ব কেন হারায়? মসৃণ ধাতু আলোকে প্রতিফলিত করে কেন? কাঁচ ভঙ্গুর কিন্তু ধাতব বস্তু বাঁকালে ভাঙ্গে না কেন? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাবই প্রায় নির্ভুলভাবে দেয়া এখন সম্ভব কোয়ান্টাম বল বিদ্যার সাহায্যে। এই বর্ধিত জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা এমন অভিনব সব বস্তু উদ্ভাবন ও প্রচলিত বস্তুর মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্যের আরাপ করতে সক্ষম হচ্ছে।

বস্তু গবেষণায় পদার্থ বিজ্ঞানের মূল বিষয় হলো– বস্তুর বাহ্যিক যে গুণাগুণ তা কিভাবে এর আভ্যন্তরীণ গঠনের উপরে নির্ভরশীল তা এখন উদঘাটিত হয়েছে। কয়েকটি ধাপে এই

আভ্যন্তরীণ গঠনকে আমরা বিন্যস্ত করতে পারি। প্রথমত পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলোর বিন্যাস ও ঘনত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে এদের বিন্যস্ত হবার ও পারস্পরিক প্রভাব প্রদর্শন। এর পরের ধাপ হল কেলাসের ল্যাটিসের মধ্যে পরমাণুর বিন্যাসে এক একটি কোষ নির্দেশিত হওয়া। এরপর তৈরী হয় অনেক এক কোষ থেকে বস্তুর ব্যাপক বা কণা সৃষ্টি। এই বস্তু কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় আকারের বস্তু গঠন করে। এটা হল জমাট বাঁধা কঠিনাবস্থায় বস্তুর কথা।

কোনো বস্তু বাঁকালেন ভেঙ্গে যাবে কিনা, কতটা তাপ সহ্য করবে, এর ভৌত গুণাগুণ দিক নির্ভর হবে কিনা, বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী হবে অথবা অপরিবাহী হবে। আলো এর দ্বারা প্রতিফলিত, শোষিত অথবা এর প্রতিসারিত হবে এসবই পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের বিন্যাস এবং সিলারস বা জমাট পদার্থের মধ্যে পরমাণুর বিন্যাসের উপরে নির্ভর করে। বস্তু বিজ্ঞানের মূল অবদান হল, বস্তুর বাহ্যিক গুণাগুণকে এর আভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা। এখানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা হচ্ছে মূল তত্ত্বগত ভিত্তি, যা পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের বিন্যাস এবং কেলাসের মধ্যে আন্তঃ পারমাণবিক বন্ধন নির্ধারণ করে। মূল ঘটনাটি ঘটে এভাবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে নিয়ম মেনে ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর মধ্যে বিন্যস্ত হয়। এখানে পাউলি বর্ষণ নীতি, তাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি ও পরমাণুর কক্ষগুলোতে ইলেকট্রন বিন্যস্ত হওয়ার হুন্ডসের সূত্র-এই নিয়মগুলোর ভিত্তিতে ইলেকট্রন পরমাণুর মধ্যে বিন্যস্ত হয়। জমাট বাঁধা অবস্থায় কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলো পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসে তখন তারা কেমন ভাবে বিন্যস্ত হবে তা নির্ভর করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়ম লংঘন না করে সমগ্র ব্যবস্থার মোট শক্তি কতটা কমানো যায় তার উপর, বিষয়টির জটিল গাণিতিক কারণ প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে শত কোটি পরমাণু রয়েছে জমাট পদার্থে। এদের সবার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও অবস্থান নির্ধারক হিসেব করে বের করা কোনো সুপার কম্পিউটার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সমাধানটি সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে একটি কেলাসের মধ্যে পরমাণুগুলো পর্যায়ক্রমে সাজানো হলে একটি পরমাণুর পরিবেশকে জানতে পারলে অন্য পরমাণুর ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য হবে এমন একটি সরলীকরণ শর্ত আমরা বহন করতে পারি।

এছাড়া, পরমাণুর বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলো অর্থাৎ ভেলেন্স ইলেকট্রনগুলো শুধু পরমাণবিক বন্ধন এবং কেলাসের ভৌত গুণাগুণ নির্ধারণের জন্য দায়ী এমনটি আমরা ধরে নিতে পারি। কোনো জমাট পদার্থের দৃঢ়তা এর তাপীয় বৈদ্যুতিক, চুম্বক ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্ধারণ করে এই বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলোর অনুমোদিত বিন্যাস, আন্তঃপারমাণবিক এলাকায় এদের চলাচল। যেমন-ধাতব পদার্থ যে বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী, অভঙ্গুর ও নমনীয় মসৃণ ধাতব তল যে আলোর প্রতিফলন ঘটায় এবং এটি যে অস্বচ্ছ এ সবই ব্যাখ্যা করা মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর বিন্যস্ত ধাতব আইনগুলোর মধ্যে ছুটাছুটির স্বাধীনতা। কোনো বস্তু যে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী অথবা অপরিবাহী সেটাও নির্ধারণ করে যোজন ব্যান্ড ও পরিবাহী ব্যান্ডের মধ্যে শক্তি পার্থক্য এবং এই ব্যান্ডগুলোর কত টা শক্ত । এই বিষয়গুলো ক্রমাগত

ছচ্ছতর রূপে জেনে এ বিশেষণ করে বস্তু বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রেই অভিনব বস্তুর উদ্ভাবন এবং প্রচলিত বস্তুর মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের স্বাধীনতা লাভ করেছে। তত্ত্বের সঙ্গে সহায়ক হয়েছে পরীক্ষামূলক গবেষণা যেমন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, ট্রান্সমিশন ইলেট্রন মাইক্রোস্কোপ স্ক্যানিং, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ এর ব্যবহার এক্স-রে ইলেকট্রন ও নিউট্রন ডিফ্রাকশন, নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেস, কোয়ান্টাম ইন্টারফেয়ারেন্স ডিভাইস, মলিকুলার বীম এপিট্যাক্সি, ফিল্ড আয়ন মাইক্রোসি ইত্যাদি আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা গভীরতর উপলব্ধি দিয়েছে বস্তু জগৎ সম্পর্কে।

অভিনব যে সব বস্তু গত অর্ধ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত হয়েছে ও নতুন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে অর্ধ পরিবাহী উন্নত সিরামিক্স, প্লস্টিক ধাতব কাঁচ, ন্যানো পার্টিকেল ও উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহী বস্তু। নতুন এসব বিস্ময়কর যে সব বৈশিষ্ট্য তা নিয়ন্ত্রণ করছে মৌলিক উপাদান নয় বরং জমাট পদার্থর মাইক্রো গঠন ও নিয়ন্ত্রিতভাবে এতে সংযোজিত রাসায়নিক বা বিন্যাসের ত্রুটি।

বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বা Extrinsic semiconductor এর বেলায় কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ খাদ মিলিয়ে এর অর্ধ পরিবাহিতায় বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখন এর মধ্যে রাসায়নিক ভিত্তি বিন্যাসগত পর্যায়ক্রম সৃষ্টি করে অভিনব বৈশিষ্ট্য এতে সংযোজিত হচ্ছে। মলিকুলার বীম এপিট্যাক্সি এর সাহায্যে পর্যায়ক্রমিক স্তর সৃষ্টি করা হচ্ছে। অর্ধপরিবাহী বস্তুর যা পারমাণবিক স্তরে মসৃণ।

অধ্যাপক ড. আলী আসগর
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, (বুয়েট)
ঢাকা-১০০০।

ক্রোমিয়াম বিষাক্ততা

অধ্যাপক ড. নিশীথ কুমার পাল

অনেক শিল্পে, যেমন ট্যানারি, টেক্সটাইলস ফেরোক্রোম ডাই, ইলেকট্রোপ্লেটিং ফটোগ্রাফি ইত্যাদি ক্রোমিয়াম এবং এর যৌগ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রোমাইট হলো একমাত্র জানা অর্থনৈতিকভাবে গরুত্বপূর্ণ ক্রোমিয়ামের খনিজ এবং ক্রোমিয়ামের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রায় সবগুলি শিল্পকারখানার উৎপত্তি হয়েছে ক্রোমাইট থেকে। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগের বেশি ক্রোমাইট জমা আছে উড়িশাতে। ক্রোমাইটের খনি ও ক্রোমিয়াম ভিত্তিক শিল্প কারখানা থেকে বিষাক্ত হেক্সাভ্যালেন্ট (ষড়যোজী) ক্রোমিয়াম সম্বলিত প্রচুর পরিমাণে দূষকের উৎপত্তি ঘটে। ক্রোমিয়ামের ওপর ভিত্তি করা কল, শিল্প কারখানার শ্রমিকরা ক্রোমিয়ামের বিষাক্ত প্রভাবের সম্মুখীন হয়। এ রকম বিষাক্ত প্রভাবের পরিসর হলো আলসারস, অ্যালার্জিক ডার্মাটাইটিস ও ফুসফুসের ক্যানসার থেকে কিডনির সমস্যা ও লিভার নেক্রোসিস পর্যন্ত।

ক্রোমিয়ামের ওপর ভিত্তি করে শিল্প কারখানা মূলত ডাস্ট (ধুলো), স্ল্যাগ ও প্রক্রিয়াজাত জলের আকারে দূষকের উৎপত্তি হয়। সাইনিং, মেটালারজিক্যাল ও রাসায়নিক শিল্প কারখানা থেকে প্রচুর জল এবং প্রক্রিয়াজাত (প্রসেস) জল অবশ্যই হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম দ্বারা কলুষিত হয়। ট্রিটমেন্ট ছাড়াই খনির জল নিকটবর্তী জলের উৎসের সাথে (পানীয় ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত) মিশে যায়। কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাত জল পরিশোধন করা হয়। সাধারণত স্ল্যাগ মাটির ওপর জমা করে রাখা হয়। এতে বিভিন্ন যোজনীয়র ক্রোমিয়াম যৌগ থাকে। এখনও অজ্ঞাত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম তৈরি হয়, যা আবার বর্ষাকালে চুইয়ে মাটির নিচে চলে যায় এবং ভূ-উপরিস্থির জলে গিয়ে মিশে। কখনো কখনো যান্ত্রিকভাবে স্ল্যাগ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং এর জন্য জল দূষিত হয়।

চামড়ার ট্যানিং, ইলেকট্রোপেটিং, বাইক্রোমেট তৈরির রাসায়নিক কারখানা থেকে মুক্ত হওযা কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ যথেস্ট ক্ষতিকারক। বাইক্রোমেট প্যান্টের কঠিন বর্জ্য পদার্থ নিকটবর্তী পানীয় জলের উৎসকে স্থায়ীভাবে কলুষিত করে চুয়ানোর কারণে। হেক্সভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম [Cr(vi)] মাটির সাথে যুক্ত হয় না, যদি না এতে কিছু পরিমাণে জৈব পদার্থ না থাকে। এই হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম মাটির নিচে অ্যাকুইফারে (জমা হওয়া জল) জমা হয়। ভারতের লুধিয়ানাতে যেখানে ইলেকট্রোপ্লেটিং কারখানা প্রাচুর্য আছে, সেখানকার ভূগর্ভস্থ জলে Cr(vi) এর মাত্রা পাওয়া গেছে প্রতি লিটারে ১২ মিলিগ্রামের বেশি। নতুন দিল্লীর যমুনা নদীর জলে উচ্চ মাত্রায় ক্রোমিয়াম আছে। উত্তর প্রদেশের কানপুর খুবই শিল্পসমৃদ্ধ শহর। এখানে

অনিয়ন্ত্রিতভাবে বর্জ্য পদার্থ জমাকরণের জন্য ভূগর্ভস্থ জলে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ প্রতি লিটারে ৩১ মিলিগ্রামের বেশি। কতিপয় গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপর ক্রোমিয়ামের প্রভাব আছে। মানুষের শারীরবৃত্তিক কাজের জন্য ত্রিযোজী ক্রোমিয়ামকে এক অত্যাবশ্যক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে গবেষণাগারের প্রাণীর গ্লুকোজ বিপাক, লিপিড বিপাক, আয়ুস্কাল, বৃদ্ধি ও প্রজননের ওপর প্রভাবের ভিত্তি করেই অধিকাংশ মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা খাদ্যের মাধ্যমে অধিকাংশ প্রাত্যহিক ক্রোমিয়াম গ্রহণ করি (৫০-২০০ মাইক্রোগ্রাম) ত্রিযোজী আকারে। এর খুব সামান্য অংশই (০.৫-৩%) গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল ট্রাক্টে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়। ষড়যোজী ক্রোমিয়ামের ক্ষুদ্র আয়নগুলি কোষ ঝিলীর সাথে লেগে থাকে। কোষে প্রবেশের পর ষড়যোজী Cr (vi) ক্রোমিয়াম আয়ন ত্রিযোজী [Cr(iii) আয়নে পরিণত হয়, যা কিছুটা বড়।

দ্রবণীয় ক্রোমেটের জন্য লিথাল ওরাল মাত্রা হলো প্রতি কেজি শরীরের ওজন ৫০ মিলিগ্রাম। প্রকট বিষাক্ততার ক্লিনিক্যাল লক্ষণ হলো বমি, ডায়রিয়া, হিমোরাজিক ডায়াথেসিস ও গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল ট্যাক্টে রক্তক্ষরণ, যার জন্য কার্ডিওভাস্কুলার শকের সৃষ্টি হয়। ক্রোমিয়াম ভিত্তিক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা সামান্য পরিমাণ ক্রোমিয়াম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারেন না। বাতাসবাহিত অথবা কঠিন অথবা তরল ক্রোমিয়াম যৌগের সংস্পর্শে বেশি সময় থাকার জন্য, এমন কি সামান্য পরিমাণে হলেও বিষাক্ত প্রভাবের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘসময় cr(vi) এর সংস্পর্শে থাকার জন্য আলসারস, চামড়ায় প্রদাহ ও অ্যালার্জিক ডারমাটাইটিস হয়। ক্রোমাইটের ধুলো গ্রহণের জন্য ন্যাসাল সেপ্টাম বা নাকের ঝিলী ফুটো হয়ে যায়, ব্রনকেপালমোনারি ট্র্যাক্টের ক্ষয় এবং এমন কি ফুসফুসের ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। কিডনিতে এটি টিবিউলার নেক্রোসিস সৃষ্টি করে এবং লিভারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অনেক দেশেই, যেখানে ক্রোমাইট শিল্প কারখানা আছে, নিয়ন্ত্রণকারী পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেছে। যেমন জার্মানি একটি নির্গমন সুরক্ষা আইন চালু ও পরিস্কার (নির্মল) বায়ুর জন্য একটি টেকনিক্যাল নির্দেশাবলী (গাইডেন্স) প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশাবলী অনুসারে, বাতাসে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থের, যেমন– ক্রোমিয়াম vi পরিমাণ প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে ১ মিলিগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। মোট ধুলোর ঘনমাত্রা হলো প্রতি ঘনমিটারে ২০ মিলিগ্রাম এবং ধুলোর আকারে অন্যান্য অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ৫ মিলিগ্রাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে সংশোধিত ক্লিন এয়ার এ্যাক্ট-এ, ফেরোক্রোম শিল্প কারখানায় বায়ু দূষণ সীমিত করার জন্য সকল রাজ্যে দূষকের আদর্শসীমা বলবত করা হয়েছে। ক্রোমিয়ামের ওপর ভিত্তি করা শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনার পর্যায়েই দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, কারণ নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল। মাটির নিচে Cr(vi) ইতোমধ্যে পৌছে গেলে তেমন কিছু আর করার থাকে না। এটি সাধারণত ঘটে বাইক্রোমেট ফ্যাক্টরির কাছে অথবা ক্রোমাইট মাইনওয়াটার ডিসচার্জ পয়েন্টে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ রকম অবস্থা তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ইতোমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, যদি শোধন করে জল

cr(vi) এর পরিমাণ কিছুটা কমানো যায়, তাহলে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত না হলেও, গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্ন অম্লতায়, Cr(iii) আর্দ্রতাবিশেষিত হয়ে অদ্রবণীয় হাইক্লোক্সাইড পরিণত হয় এবং সহজেই মৃত্তিকার ম্যাট্রিক্সে লেগে থাকে। এর দ্রবণীয় অবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। অপর দিকে, অম্লীয় ও ক্ষারীয় উভয় অবস্থাতেই Cr(vi) সুস্থির এবং মৃত্তিকার ম্যাট্রিক্সে লেগে থাকে না। এটি সচ্ছিদ্র মাধ্যম দিয়ে চুইয়ে ভূগর্ভস্থ জলে জমা হয়। কিছুটা অম্লীয় অবস্থায় (পিইচ <৪), হিউমাস বা বায়োমাসের মতো জৈব পদার্থ দ্বারা Cr(vi) বিজারিত হয়।

সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বিজারক হলো ফেরাস সালফেট অথবা ফেরাস ক্লোরাইড, যা আবার শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ। উপযুক্ত পিআইচে, Cr(iii) এবং Fe(iii) হাইড্রোক্সসাইড তৈরি হয়। ফ্লোকুলেশন অথবা উপযুক্ত বস্তু কর্তৃক পরিশোষিত হওয়ার জন্য অদ্রবণীয় হাইড্রোক্সসাইড পৃথক হয়। সোডিয়াম সালফাইট হলো অপর একটি বিজারক যা এ কাজে উপযুক্ত। বিকল্পভাবে, সালফার ডাই-অক্সাইড অথবা সোডিয়াম পলিসালফাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। কেয়োলিনাইট, ক্লোরাইট এবং আরফা কোয়ার্জের মতো কতিপয় ক্লে খনিজ দ্রবণ থেকে ০০০ পরিশোষণ করে। এই পরিশোষণ নির্ভর করে পিএইচের ওপর। ইফ্লুয়েন্ট থেকে Cr(vi) অপসারণের কাজে সক্রিয় রেড মাড এবং বাস্ট ফারনেস স্ল্যাগও ব্যবহার করা হযেছে। কয়লা ও কোক পছন্দ করা হয়, কারণ এগুলো কেবলমাত্র ভালো পরিশোষণ করে না, সেই সাথে Cr(vi) কে Cr(iii) অবস্থায় বিজারিত করতে পারে। ষড়যোজী ক্রোমিয়ামকে খুব ভালভাবে পরিশোষন করতে পারে অজৈব অক্সাইডস অথবা অক্সিহাইড্রোক্সাইডস। Fe(iii) হাইড্রোক্সাইড খুব কম পরিমাণে Cr(vi) পরিশোষণ করে। সক্রিয় অ্যালুমিনিও খুব ভালভাবে পরিশোষণ করে। তাপ বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র অথবা সার কারখানার কতকগুলো বর্জ্য পদার্থ Cr(vi) পরিশোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, জলীয় দ্রবণ থেকে Cr(vi) অপসারণে ফ্লাই অ্যাশ ও চিনামাটির মিশ্রণ কার্যকর। কচুরিপানাও, একে আমরা জঞ্জাল মনে করি, অনেক ভারী ধাতু পরিশোষণ করে। চিনি, Cr(vi) অপসারণে এই আগাছা ব্যবহার করা হয়।

এটি অত্যন্ত জরুরী যে, পানীয় জলের সরবরাহে ও কৃষি জমিতে এই মারাত্মক ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের চোয়ানো বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো সকল ক্রোমিয়াম ভিত্তিক শিল্প কারখানাগুলো যাতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা যথাযথভাবে মেনে চলে তা সুনিশ্চিত করা।

অধ্যাপক ড. নিশীথ কুমার পাল
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

খাদ্যে আঁশের গুরুত্ব

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

আঁশ সরাসরি খাদ্যের উপাদান নয়। তবু খাদ্যের আঁশ মানব দেহের জন্য যে উপকারী এ নিয়ে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। চিকিৎসকগণ এবং পুষ্টিবিদগণ আঁশ জাতীয় খাবার গ্রহণের জন্য এখন পরামর্শও দিয়ে থাকেন। আগে খাদ্যের আঁশ নিয়ে মানুষকে খুব একটা ভাবতে হতো না। ফলমূল আর শাক-সবজির পাশাপাশি অমসৃণ চাল আর লাল আটা খাওয়া হতো বলে আঁশের কোন অভাব ঘটতো না। মসৃণ চাল আর সাদা আটার পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত খাবারের প্রতি মানুষের বাড়তি আকর্ষণের কারণে খাদ্যে আঁশের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে মসৃণ দানা শস্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে আঁশ সংযোজন করার মাধ্যমে খাদ্য আঁশের চাহিদা মেটাবার কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে অনেক দিন ধরেই। আমাদের দেশে এখনও খাদ্যের সাথে আঁশ সংযুক্ত করার কোন পদ্ধতি শুরু হয়নি বলে শাকসবজি, ফলমূল কম খায় তেমন মানুষের জন্য খাদ্যে আঁশের ঘাটতি দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুস্থ ও সবল দেহ রক্ষার জন্য তাই পরিমিত পরিমাণ খাদ্য আঁশ গ্রহণ বেশ জরুরী।

পূর্ব আফ্রিকায় কাজ করা দুই জন চিকিৎসকের একটি চমৎকার পর্যবেক্ষণ থেকে খাদ্যে আঁশের গুরুত্ব কত তা একটি নিবন্ধের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতন মানুষ জানতে সক্ষম হয়। উগান্ডার যেসব মানুষের খাদ্য অপরিশোধিত উদ্ভিজ্জ খাদ্য সমৃদ্ধ ছিল তাদের কখনো কৌষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়নি এবং এরা বেশ ডায়াবেটিস, হৃদপিণ্ডের রোগ এবং মলাশয় ক্যানসার মুক্ত ছিল। অন্যদিকে পরিশোধিত খাদ্য গ্রহণকারী মানুষের মধ্যে এসব রোগের হার ছিল পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রকাশনাটি চিকিৎসকদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় এবং পরে এ নিয়ে অনেক গবেষণা করা হয়। সব গবেষণার ফলাফল এই যে, খাদ্যের আঁশ দেহের জন্য বেশ উপকারী। অনেক উন্নত দেশই এখন প্রতিদিন কতটুকু আঁশ খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত তা তাদের জনগণের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি এফএও-এর অর্থায়নে আমাদের দেশে পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে আমাদের দেশের জনসাধারণের জন্য কতটুকু আঁশ জাতীয় খাবার গ্রহণ করা উচিত বয়স ভিত্তিক সে হিসেব তাতে দেওয়া হয়েছে (সারণি ৮.১)।

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ডে ২০০৫ সনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য অনুমোদিত আঁশের পরিমাণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯–৫০ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ান পুরুষদের জন্য দৈনিক আঁশের অনুমোদিত মাত্রা যেখানে ৩৮ গ্রাম সেখানে নিউজিল্যাণ্ডের মানুষদের জন্য তা ৩০ গ্রাম। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দেশেই ঐ বয়সের অনুমোদিত আঁশের মাত্রা সমান

অর্থাৎ তা প্রতিদিন ২৪ গ্রাম। অন্যদিকে ৫১–৬৫ বছরের বয়সী মানুষের জন্য পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দেশেই তা ৩০ গ্রাম হলেও মহিলার ক্ষেত্রে আবার তা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২০ গ্রাম আর নিউজিল্যাণ্ডের জন্য ২১ গ্রাম। তবে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য উভয় দেশেই তা প্রতিদিন ২৮-৩০ গ্রাম। এ দু'টি দেশের যে কোন একটি দেশের দৈনিক অনুমোদিত আঁশের মাত্রা আমাদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

খাদ্য আঁশ হলো উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সেসব অংশ যা সাধারণত এনজাইম দ্বারা পরিপাক করা সম্ভব হয় না। উদ্ভিদের সকল অপরিপাকযোগ্য পলিসেকারাইড, লিগনিন, পেকটিন, গাম, মিউসিলেজ, সেলুলোজ এবং হেমিসেলুলোজ খাদ্য আঁশের অন্যতম উপাদান। এদের মধ্যে পানিতে অদ্রবণীয় আঁশ হলো সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ এবং লিগনিন। আর পানিতে দ্রবণীয় আঁশ হলো পেকটিন, গাম এবং মিউসিলেজ। অধিকাংশ খাদ্যেরই এখন আঁশের পরিমাণ নির্ধরণ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ আটা, বাদামী এবং সাদা আটায় যথাক্রমে শতকরা ৮.৫ ভাগ, ৫.১ ভাগ এবং ২.৭ ভাগ; পত্রল সবজিতে তা শতকরা ২.৫-৩.৫ ভাগ; গোলআলু এবং কন্দাল সবজিতে তা শতকরা ১-২.৫ ভাগ এবং ফলে প্রায় শতকরা ২.৩ ভাগ (সারণি ৮.২)।

বয়স (বছর)	শরীরের ওজন (কেজি)		আঁশ (গ্রাম/প্রতিদিন)			
			অস্ট্রেলিয়ার অনুমোদিত		নিউজিল্যাণ্ডের অনুমোদিত	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১-৩	১১.৪৩-১৫.৬৭	১০.৭৯-১৫.০৬	১৯	১৯	১৪	১৪
৪-৮	১৭.৬৯-২২.৫৫	১৬.৮১-২২.০৯	২৫	২৫	১৮	১৮
৯-১৩	২৫-৩৮.৬৩	২৪.৮২-৪০.৭১	৩১	২৬	২৪	২০
১৪-১৭	৪৩.৯৬-৫৮.৬৪	৪৩.২২-৪৮.৫১	৩৮	২৬	২৮	২২
১৮	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৩৮	২৬	২৮	২২
১৯-৫০	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৩৮	২৫	৩০	২৫
৫১-৬৫+	৪৫-৭৫	৪০-৭৫	৩০	২০	৩০	২১
গর্ভবতী	-		-	২৮	-	২৫-২৮
দুগ্ধ দানকারী	-	(০-৬ মাস)	-	২৯	-	২৭-৩০
দুগ্ধ দানকারী	-	(৭-১২ মাস)	-	২৯	-	২৭-৩০

সারণি ৮.১। বয়স ও ওজন ভেদে দৈনিক আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমোদিত মাত্রা

খাদ্যে পরিমিত পরিমাণ আঁশ গ্রহণ করলে যেসব উপকার পাওয়া যায় সেগুলে হলো-

❖ আঁশ কৌষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। আঁশ অন্ত্রের ভেতর একটি স্বাভাবিক চলনক্ষম অবস্থা বজায় রাখে বলে মলত্যাগ ত্বরান্বিত হয় এবং ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

❖ মলাশয়ে বসবাসরত ব্যাকটেরিয়া নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। এরা মলাশয়ে অনেকক্ষণ ক্রিয়া করতে থাকলে মলাশয়ের ক্যানসার সৃষ্টির ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। খাদ্যের আঁশ পানি এবং এসব রাসায়নিক বিষাক্ত যৌগ পরিশোষণ করে বলে

এদের ভর বেড়ে যায় এবং দ্রুত এরা দেহ থেকে বাইরে চলে আসতে পারে বলে মলাশয় ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকটাই হ্রাস পায়।

❖ আঁশ দেহের গ্লুকোজ সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। আঁশের উপস্থিতিতে অন্ত্র থেকে ধীর গতিতে গ্লুকোজ পরিশোষণের কারণে এটা হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস রোগীদের পেকটিন বা গাম জাতীয় আঁশ গ্রহণ রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি-হ্রাস করে থাকে। ফলের রস গ্রহণের চেয়ে আঁশ সমৃদ্ধ ফল গ্রহণ করলে রক্তে চিনির পরিমাণ অল্প বৃদ্ধি পায় কারণ অপরিশোধিত আঁশের উপস্থিতির কারণে শ্বেতসার পরিশোষণ ঘটে বেশ ধীরে ধীরে। ফলে আঁশ জাতীয় খাদ্য ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ভাল।

উৎস	মোট খাদ্য আঁশ (গ্রাম/১০০ গ্রামে)		উৎস	মোট খাদ্য আঁশ (গ্রাম/১০০ গ্রামে)	
	তাজা ওজন	শুষ্ক ওজন		তাজা ওজন	শুষ্ক ওজন
ফল			**পত্রল সবজি**		
আপেল (তাজা)	১.৪২	৯.১৬	ব্রোকলী (উপরীভাগ)	৩.৬০	৩২.৭
কলা	১.৭৫	৫.৯৭	ব্রাসেলস স্পাউট	৪.২২	২৭.৪
চেরী	১.২৪	৬.৭০	বাঁধাকপি	২.৬৬	২৭.৪
ক্যানজাত আঙ্গুর	০.৪৪	২.৪২	পেঁয়াজ	১.৩০	১৮.১
কমলা	১.৯০	১৩.৭	**কন্দাল সবজি**		
পীচ	২.২৮	১৬.৫	গাজর	২.৯০	২৮.৪
নাশপাতি	২.৪৪	১৪.৭	শালগম	২.৪০	২২.১
আলুবোখরা	১.৫২	৯.৫৬	গোলআলু	৩.৪১	১৪.১
ষ্ট্রবেরী	২.১২	১৯.১	**দানা শস্য**		
টমেটো (তাজা)	১.৪০	২.১৯	সাদা আটা (৭২%)	-	৩.৪৫
শিম্বী ফসল			বাদামী আটা (১০০%)	-	৮.৭০
ফ্রিজজাত মটর	৭.৭৫	৩৭.১	যবের গুড়া	-	৭.৬৬
ক্যানজাত মটর	৬.২৮	৩৪.১	চাল, লম্বা দানা	-	১২.৭
			রাই, সম্পূর্ণ আটা	-	১২.৭

সারণি ৮.২। কিছু ফল, সবজি, শিম্বি, কন্দাল ফসল ও দানা শস্যে বিদ্যমান খাদ্য আঁশ

❖ আঁশ অন্ত্র থেকে কোলেষ্টেরল পরিশোষণকে নিরুৎসাহিত করে। আঁশ পাচক রসের লবণকে আটকে দেয় এবং কোলেষ্টেরলকে এসব লবণ দ্বারা ভেঙ্গে দেয় এবং তা দেহ থেকে বেড় করে দেয়। এজন্য বলা হয় আঁশ দেহের কোলেষ্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং হৃদরোগের ঝুঁকিও অনেকটা কমিয়ে দেয়।

❖ খাদ্যে আঁশের উপস্থিতি গ্রহণকৃত খাদ্যের ওজন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ফলে

খাদ্য গ্রহণ করে পেট পূর্তি ঘটেছে এরকম অনুভূতি একটি সৃষ্টি হয়। ফলে অতিরিক্ত ক্যালরিজাত খাদ্য গ্রহণ না করেও আঁশের কারণে খাদ্যের তৃপ্তি অর্জিত হয়।

❖ পরিশোধিত শ্বেতসার যেমন- চিনির দাঁত নষ্ট করার ক্ষমতা অধিক। উচ্চ আঁশ যুক্ত

খাদ্যে পরিশোধিত চিনির পরিমাণ কম হওয়ায় দাঁতের ক্ষয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

- ❖ দ্রবণীয় আঁশ যেমন- গাম এবং পেকটিন রক্তের নিম্ন-ঘনত্বের লিপোপ্রোটিন (LDL) মাত্রা হ্রাস করে। এরা অন্ত্রের কার্যাবলীর জন্য সহায়ক।

অধিক পরিমাণ আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ আবার নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি করে। বয়স অনুযায়ী ওজনভেদে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আঁশ যেন খাবারের মাধ্যমে আমরা পাই সেটি তাই খেয়াল রাখা দরকার। দেহের চাহিদার চেয়ে অধিক পরিমাণ আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তাহলো-

- ❖ খাদ্যের পরিপাক এবং আমিষ পরিশোষণকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে।
- ❖ অন্ত্রের কিছু কিছু খনিজ পদার্থ যেমন- ক্যালসিয়াম, দস্তা, লোহা, ফসফরাস এবং ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি পরিশোষণের মাত্রা কমিয়ে দেয়।
- ❖ অন্ত্রে বিদ্যমান ব্যাকটেরিয়া কিছু আঁশকে গাঁজন করে ও পেটে বায়ু উৎপন্ন করে এবং তা অস্বস্তির কারণ হয়ে থাকে।

ফল, পত্রল সবজি, অন্যান্য সবজি, গোটা গম, শিম এবং ডাল শস্য দানা, চালের কুঁড়া কিংবা বাদামী চাল আঁশের সমৃদ্ধ উৎস। যথাসম্ভব ঢেঁকিছাটা চাল এবং আঁশ যুক্ত লাল আটা গ্রহণের পাশাপাশি সবজি, তাজা ফল গ্রহণ করলে খাদ্যে আঁশের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে সবজিভোজী লোক অসবজিভোজী লোকদের চেয়ে বেশি আঁশ গ্রহণ করে থাকে। গড়পড়তা প্রতিদিন প্রায় ২৫-৩০ গ্রাম আঁশ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ এখন আমাদের দেশের মানুষের জন্য উত্তম বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
গবেষক ও লেখক
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
e-mail: ipbscfc2009@gmail.com

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের অনেকের কাছেই এটি বিস্ময়কর মনে হয় যে ১৯৬৪ সালে, প্রায় পাঁচ দশক আগে পরমাণু শক্তি কমিশনে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির প্রথম স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। এমনকি এটিও আমরা বিশ্বাস করতে চাইনা যে, সেই আইবিএম ১৬২০ কম্পিউটারটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম কম্পিউটার ছিলো এবং সেটি পরিচালনা করেছিলেন বাংলাদেশেরই কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা। এদের মাঝে নাটোরের সিংড়া উপজেলার হুলহুলিয়া গ্রামের হানিফউদ্দিন মিয়ার নামটি অবশ্যই উল্লেখ করার মতো। হতাশাজনক হলেও সত্য যে সেই গৌরবের ৫০ বছরকে আমরা গৌরবান্বিতভাবে উদযাপন করতে পারিনি। তবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সময়টাকে একটু পেছনে তাকিয়ে দেখতে পারি। একই সাথে আমরা এটিও মুল্যায়ন করে দেখতে পারি যে, আগামীতে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিকে কোন পথে যেতে হবে।

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির পাঁচ দশককে আমি অন্তত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করতে পারি। যেমন; ক) প্রথম স্তরটি ১৯৬৪ থেকে ১৯৮৭ সময়কালের। এটি আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির আদি ও প্রাথমিক যুগ। খ) দ্বিতীয় সময়টি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ সময়কালের। এটি ডেস্কটপ প্রকাশনা ও কম্পিউটারে বাংলা ভাষার বিপ্লবের যুগ। গ) আর এর পরের অধ্যায়টি ১৯৯৬ থেকে এখনকার। এটি আমাদের দারুণ অগ্রযাত্রার সময়। ঘ) চতুর্থ স্তরটি হতে পারে আমাদের সামনের সময়টি। সেটির শেষ প্রান্ত হতে পারে ২০২১ সাল অবধি।

তবে এইসব স্তরের মাঝেও ক্ষমতাসীন সরকারের ভূমিকা এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিয়ে বিভাজন রেখা আছে। যেমন ১৯৬৪ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত সময়টি ঔপনিবেশিক আমল ছিলো। পাকিস্তানীরা বাধ্য হয়ে এই অঞ্চলে কম্পিউটার স্থাপন করলেও এখানে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে কোন আগ্রহ দেখায়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে নিজেদের অস্তিত্ব টেকানোটাই বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো। তখন তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে সামনে যাবার কথা ভাবাই যেতোনা। ৭৫ থেকে ৮১ সময়কালে জিয়া সরকার এইসব বিষয়ে মোটেই আগ্রহী ছিলোনা। ৮১ পরবর্তী এরশাদ সরকার ৮৭ সালের ডেস্কটপ প্রকাশনা বিপ্লবের মাঝেও এই বিষয়ে কার্যকর কোন ভূমিকা নেয়নি। জাতীয় কম্পিউটার কাউন্সিল গঠন তাদের একটি আবশ্যকীয় উদ্যোগ ছিলো। তাই আমরা সহজেই এটি বলতে পারি যে, ৮৭ থেকে ৯৬ সময়কালের মাঝে ৯১ পর্যন্ত সরকারের ভূমিকা একরকম ছিলো আর ৯১ থেকে ৯৬ সময়কালে সরকারের ভূমিকা আরেক রকম ছিলো। এই সময়টাতে আমরা তথ্যপ্রযুক্তিতে সামনে যাবার সুযোগগুলো হাতছাড়া

করেছি। তবে ৮৭ এর ইতিবাচক দিক হলো এই সময়ে বেসরকারি খাত একটি বিপ্লবের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। এই সময়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি ভিন্ন মাত্রার ছিলো। এমনি করে ৯৬ থেকে ২০০১ সময়কালের সাথে ২০০১ থেকে ২০০৮ সময়কালের কোন তুলনা করা যাবে না। পরের সময়টা বস্তুত আটপৌঢ়ে জীবনের প্রতীক। ঐ সময়টাতে এই খাতকে বস্তুত খাচায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে ২০০৯ থেকে ২০১৫ সময়কালটি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের মধ্য গণনের সময়কাল। একে আমাদের স্বর্ণযুগ বললে ভুল বলা হবেনা। সামনের দিনগুলো হয়তো হবে আরও ভিন্ন মাত্রার। তবে সায়াহ্ন কাল যদি না আসে তবেই আমরা খুশী হবো।

যদিও সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টার কোন রকমফের হয়নি তথাপি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই ফলাফলটি ভিন্ন রকম হয়েছে। ৬৪ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত মানুষ কম্পিউটার যন্ত্রটিকে গণনা যন্ত্র, ৮৭ সাল থেকে ৯৬ পর্যন্ত কম্পিউটারকে প্রকাশনার যন্ত্র এবং ২০০৯ সালের পর একে সকল কাজের ডিজিটাল যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করছে। ৯৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এই যন্ত্রটির রূপান্তরের কাজ চলছিলো। ফলে এর ব্যবহারের মাত্রাটাও ভিন্ন মাত্রারই হয়েছে। যাহোক, ৫০ বছরের সর্বশেষ ফলাফলে অসন্তুষ্টির কোন কারণ দেখি না। যদিও প্রত্যাশা আরও বেশি হতে পারে তথাপি অর্জনটা মোটেই কম নয়। মাঝে মধ্যে খরগোসের মতো ঘুমিয়ে থেকে আবার আমরা দ্রুতগতিতে দৌড়েছি।

৬৪-৮৭॥ আদি ও প্রাথমিক যুগ: বাংলাদেশে কম্পিউটার আসার পর থেকে শুরু করে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত যে সময়টি ছিলো তাতে কম্পিউটার প্রযুক্তির সাথে সাধারণ মানুষের তেমন কোন সম্পর্কই ছিলো না। যারা কম্পিউটারে প্রোগ্রাম লিখতে পারতেন তারাই কম্পিউটার স্পর্শ করতেন। একেবারে শুরুতে কম্পিউটারের প্রসারও খুবই সীমিত ছিলো। আদমজী জুট মিলের মতো বড় প্রতিষ্ঠান, ইউনাইটেড বা হাবিব ব্যাঙ্ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বসতে থাকে। মূলত হিসাব নিকাশ ছিলো কম্পিউটারের প্রয়োগ ক্ষেত্র। যারা কম্পিউটারের সহায়তায় প্রেগ্রামিং করতে পারতেন তারাই ব্যবহার করতেন কম্পিউটার। প্রোগ্রামিং কাজটাও সহজ ছিলো না।

তবে এটি উল্লেখ করা উচিত যে, ১৯৭৬ সালের আগে দুনিয়াতে ছোট কম্পিউটারতো ছিলোই না। ফলে সারা দুনিয়ার চিত্রটাই এমন ছিলো যে, বিশেষত গণনা কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহৃত হতো এবং কেবলমাত্র প্রোগ্রামাররাই এসব যন্ত্র পরিচালনা করতো। তবে ৭৬ সালের পর দুনিয়াতে পিসির আবির্ভাব ঘটলেও তার প্রভাব বাংলাদেশে পড়েনি। এ্যাপল সিরিজের কম্পিউটারগুলো এদেশের সাধারণ মানুষের হাতে যায়নি। কেবলমাত্র ঢাকার আমেরিকান স্কুলে ব্যবহৃত হতো এগুলো। এমনকি ১৯৮১ সালে আইবিএম পিসি বাজারে আসার পরও এদেশে পিসির ব্যবহার মোটেই বাড়েনি। কিছু কিছু লোক অফিসের কাজে ওয়ার্ডস্টার, লোটাস আর ডিবেজ ব্যবহার করতেন বটে। তবে একে কোনভাবেই জীবনের মূলস্রোতের সাথে যুক্ত বলে ধরা যেতো না। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি একটি টাইপরাইটিং যন্ত্র

বা ব্যবসার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল বিষয়টি হচ্ছে ১৯৮৪ সালে এ্যাপল মেকিন্টোস জন্ম না নেয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষতো এমন যন্ত্র স্পর্শ করার কথাই ভাবতে পারতো না। মেকিন্টোস কেবল বহুভাষিকই হয়নি, মেকিন্টোস কম্পিউটারকে সাধারণ মানুষের যন্ত্রে পরিণত করে। বাংলাদেশে মেকিন্টোস ৮৭ সালে বিপ্লব ঘটায়।

ফলে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ কম্পিউটার যন্ত্রটির ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়। এই সময়টাকে আমরা আদি বা প্রাথমিক যুগ হিসেবে সূচনা পর্বও বলতে পারি। এমনকি সেই সময়ে যারা বড় কম্পিউটারের বদলে পিসি ব্যবহার করতেন তারাও সংখ্যায় এতো কম ছিলেন যে, সমাজে, রাষ্ট্রে বা অন্য কোন স্তরে তার কোন প্রভাব ছিলো না। এই সময়ে সরকারের কোন নীতিমালাই তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের জন্য সহায়ক ছিলোনা। কেউ ভাবেইনি যে, তথ্যপ্রযুক্তি নামক কোন বিষয়ে সরকারের কিছু করার আছে। অথচ ভারত ১৯৮৬ সালে তাদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে এতো আগে কম্পিউটার আসার পরও নীতি নির্ধারক; আমলা ও রাজনীতিকদের এই অক্ষমতা কোনভাবেই আমরা প্রশংসা করতে পারিনা। বরং আমাদের ভবিষ্যত বংশধররা নানা কারণে তাদের এই পূর্ব পুরুষদের দৈন্য-দশার জন্য নিজেরা লজ্জিত হবে। খুব সহজেই এই কথাটি ধরে নেয়া যায় যে, সেই সময়কার দেশের নীতি নির্ধারকদের মাঝে এই বিষয়ে সচেতনতা না থাকার ফলে আমরা ভবিষ্যতের কথাটি তখন বলতে পারিনি। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিতে উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেই সময়ে যদি যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হতো তবে আজ আমরা কোনভাবেই ভারতের পেছনে থাকতাম না।

রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করে আমরা সেই সময়ের শাসক মরহুম জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে কম্পিউটার অজ্ঞ বলে বিবেচনা করতে পারি। বিশেষ করে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ৮৭ পরবর্তী সময়টিতে আরও অনেক সচেতনতার সাথে আমাদের সামনে চলাকে এগিয়ে দিতে পারতেন।

৮৭-৯৬॥ ডেস্কটপ প্রকাশনা ও বাংলা ভাষার পিসি বিপ্লবঃ ডেস্কটপ প্রকাশনা ও বাংলা ভাষার পিসি যুগের শুরুটা একেবারেই সাদামাটাভাবে হয়েছিলো। আশির দশকের শুরুতে কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়া হতে থাকে। ৮৬ সালে সাইফুদ্দাহার শহীদ মেকিন্টোস কম্পিউটারে বাংলা লেখার ব্যবস্থা প্রচলনও করেন। সেই সময়ে পিসিতে আবহ ও পরে বর্ণ নামক বাংলা সফটওয়্যার জন্ম নেয়। তবে ১৬ মে ১৯৮৭ কম্পিউটারে কম্পোজ করা একটি বাংলা পত্রিকা যার নাম আনন্দপত্র সেটি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ডেস্কটপ প্রকাশনা বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লবের দুটি প্রভাব ছিলো। প্রথমত এর ফলে কম্পিউটার ব্যবহার করে বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ করার সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত এর ফলে সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটার পৌঁছানোর প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশে এর আরও একটি ভিন্ন মাত্রা ছিলো এজন্য যে, সেই সময়টাতে প্রথমবারের মতো আমরা নিজেদের মতো করে মাতৃভাষা ব্যবহার করার সুযোগ পাই।

যদিও ১৯৮৬ সালে বা তারও আগে কম্পিউটারে বাংলার জন্ম হয় এবং ১৯৮৬ সালেই ডেস্কটপ পাবলিশিং প্রযুক্তিতে ঢাকা কুরিয়ার নামের একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয় তবুও আনন্দপত্র ডিটিপি বিপ্লবের আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। এটি বস্তুত কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার করতে পারার জন্যই সম্ভব হয়েছে। তার চাইতেও বড় ঘটনা ঘটে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮। সেই দিন বিজয় বাংলা কীবোর্ড ও সফটওয়্যার প্রকাশিত হয় এবং এরপর বাংলাদেশের কম্পিউটার প্রযুক্তি আর কখনও পেছনে ফিরে তাকায়নি। এই বিপ্লবের যে কটি বৈশিষ্ট্য ছিলো তার মাঝে প্রধানটি হচ্ছে; সাধারণ মানুষের হাতে কম্পিউটার পৌঁছানো, সহজে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারা, বাংলা ভাষায় কম্পিউটার চর্চা করতে পারা, সৃজনশীল কাজে কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে পারা এবং শিক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারা। স্টিভ জবসের এ্যাপল কম্পিউটার কেবল বাংলাদেশেই এই বিপ্লবটি করেনি-কার্যত দুনিয়ার সর্বত্র এই বিপ্লবের সূচনা হয় মেকিন্টোস কম্পিউটারের হাত ধরে। আমাকে যদি বাংলাদেশে কম্পিউটার চর্চার সময়টিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে বলা হয়, তবে ৮৭ সালকেই আমি এর সূচনালগ্ন বলে চিহ্নিত করবো। এর আগের সময়টি কার্যত ছিলো কম্পিউটার নিয়ে কিছু লোকের নাড়াচাড়া করার সময়। এই সময়ে কম্পিউটার তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছায়। বাংলা ভাষায় কম্পিউটার বিষয়ক বই, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে এবং গণ মাধ্যমের মুল স্রোতে কম্পিউটার প্রযুক্তি তার আসন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৮৯ সালে ঢাকার আমেরিকান স্কুলে প্রথম কম্পিউটার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেই সময়েই চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলে আয়োজিত হয় বাংলাদেশ কম্পিউটার ক্লাবের কম্পিউটার মেলা। ১৯৮৭ সালে জন্ম নেয় বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি যেটি ১৯৯২ সালে সরকারের কাছে নিবন্ধিত হয়। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ঢাকায় আয়োজন করে কম্পিউটার মেলা।

এই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের একটি বড় ঘটনা ঘটে যায় ডেস্কটপ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তখন একটি দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। আমরা আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলমান সাবমেরিন ক্যাবল লাইনে যোগ দিইনি। আমাদের তখনকার নীতি নির্ধারকগণ তখন মনে করেন যে, এর ফলে দেশের সকল তথ্য পাচার হয়ে যাবে এবং দেশটির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। তখনকার বাংলাদেশের সরকার ৯২ সালে একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সময়ে আমাদের বঙ্গোপসাগর দিয়ে সি-মিউ-উই-৩ নামক সাবমেরিন ক্যাবল লাইন স্থাপিত হয়। তখন বাংলাদেশকে সেই সংযোগ গ্রহণ করার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু বিনামূল্যে সেই সংযোগ আমরা গ্রহণ করিনি। এর ফলে বাংলাদেশকে একটি দ্রুত গতির সংযোগ পাবার জন্য ২০০৬ সালের মে মাস অবধি অপেক্ষা করতে হয়। এটি বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দারুনভাবে পিছিয়ে ফেলে। অন্যদিকে দুনিয়াতে ইন্টারনেটের আগমন, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রসার এবং দ্রুত গতির প্রসেসরের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি একটি নতুন দিগন্ত প্রসারিত হয়। ৯৩ সালের পর ডেস্কটপ প্রকাশনায় উইন্ডোজ পিসি অবদান রাখে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পিসির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। আমরা তখনও ইন্টারনেটের যুগে পা রাখতে পারিনি।

৯৬-২০০৮॥ সুবর্ণযুগের উষালগ্নঃ সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের সুবর্ণ সময়টির সূচনা হয় ১৯৯৬ সালের ২৩ জুনের পর। সেদিন বাংলাদেশ প্রথম অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করে। ১৯৯২ সালে স্কুলে কম্পিউটার শিক্ষা পাঠ্য করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ৯৬ সালে সেটি পাঠ্য হয়। ৯৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিষয়টি পাঠ্য হয়। এরপর ৯৭ সালে বাংলাদেশ মোবাইলের মনোপলি ভাঙ্গে। ৯৬ সালেই দাবি ওঠে শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত কম্পিউটারের। ৯৮-৯৯ সালের বাজেট থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকার কম্পিউটারের ওপর থেকে সকল প্রকারের শুল্ক ও ভ্যাট তুলে নেয়। কম্পিউটার শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। একই সময়ে সরকার জেআরসি কমিটির ৪৫টি সুপারিশ গ্রহণ করে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সুপারিশের অংশ হিসেবে ৯৭ সালের ডিসেম্বরে সরকার, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো একটি আন্ত মন্ত্রণালয় সেমিনারের আয়োজন করে যেখান থেকে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও সেবা খাত রপ্তানীর এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করে। ৯৭ সালে জন্ম নেয় বেসিস।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ২০০১ সালের বাংলাদেশে ক্ষমতার পালাবদল হবার পর তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি খালেদা সরকারের মনযোগে ভাটা পড়ে। এই সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নামের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শব্দটি যোগ করা, ২০০৩ সালের জেনেভায় তথ্যসমাজ সম্মেলনে যোগদান এবং ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হওয়া ছাড়া সেই সময়কার সরকার কেবল শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত কম্পিউটারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এই পাঁচ বছরেও যদি ৯৬-০১ সালের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্ব পেতো তবে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অভিযাত্রা আরও মসৃণ হতে পারতো। ২০০৭ ও ২০০৮ সালে অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তূলনামূলকভাবে বেগম জিয়ার সরকারের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিলেও বিষয়টিতে তাদের সর্বোচ্চ নজর ছিলো না। এই সরকারের আমলের সবচেয়ে বড় কাজের একটি হচ্ছে ছবিসহ ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রণয়ন। এই সরকার একটি আইসিটি নীতিমালার খসড়াও তৈরি করে। এই আমলেই স্কুল-কলেজে কম্পিউটারকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশও করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ॥ একুশ শতকের সোনার বাংলাঃ বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের তথ্যপ্রযুক্তি যাত্রার সবচাইতে উজ্জ্বল সময় হচ্ছে ২০০৯ সালের পরের সময়টি। যদিও ২০১৩ সালে একটি সরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছে তথাপি একই সরকারের ধারাবাহিকতা বহাল থাকায় ২০০৯ সালের কর্মসূচিসমূহ এখনও অব্যাহতভাবেই চলছে। আমি এই ধারণা পোষণ করতে পারি যে, এই সরকার দেশ পরিচালনা করলে তাদের কর্মসূচিও অব্যাহত থাকবে। এবার ২০১৪ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ অবশ্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছে।

২০০৭ সালে আমরা প্রথমবারের মতো ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করি (মাসিক কম্পিউটার জগত, এপ্রিল ২০০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ২০০৮ সালেও আমরা একই বক্তব্য

প্রকাশ করি। সেই বছরের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের ইশতেহার প্রকাশ করেন। তিনি তাতে ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সেই নির্বাচনে জয়ী হবার পর শেখ হাসিনার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। ২০০৯ সালের শুরুতেই গ্রহণ করা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা। এরপর গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার অনেকগুলো মাইলফলক কাজ করেছে।

১) "জনগণের দোরগোড়ায় সেবা" এই শ্লোগানটি অনেক পুরানো হলেও এবারই প্রথম ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (বর্তমান নাম ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র) স্থাপন করে সেখান থেকে গ্রামের মানুষকে সরকারি সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২) জেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসহ উপজেলা স্তরের অফিসগুলোর ডিজিটাল রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। জেলায় ডিজিটাল পদ্ধতির সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) এই সময়ে মাত্র ১২ লাখ ইন্টারনেট গ্রাহক প্রায় সাড়ে ৪ কোটিতে ওঠেছে। মোবাইলের সাড়ে ৪ কোটি গ্রাহক ১২ কোটি ছাড়িয়েছে। এসেছে থ্রিজি। জেলা শহরগুলো চলে এসেছে থ্রিজির আওতায়। ব্যান্ডউইদথের দাম কমে হয়েছে ২৮০০ টাকা।

৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গড়ে ওঠেছে কম্পিউটার ল্যাব ও ডিজিটাল ক্লাশরুম। তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল কনটেন্টস। প্রশিক্ষিত হচ্ছে শিক্ষকগণ।

৫) সফটওয়্যার ও সেবাখাতে রপ্তানী বেড়েছে। মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানী ২৫০ মিলিয়ন হয়েছে। ২৫০ মিলিয়ন ডলারের রপ্তানীকে ২০১৮ সালে ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। অন্তত ৬২ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কর্মসূচি হাতে নিয়ে সফটওয়্যার পার্ক, হাইটেক পার্ক ও ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৬) মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি মোবাইলভিত্তিক সেবার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিনে ৩৩০ কোটি টাকার লেনদেন কেবল মোবাইল ফোনেই হয়েছে।

৭) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রণালয় নামে ডাক ও টেলি যোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নামক দুটি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে এই খাতের গুরুত্বকে অনুধাবন করে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। আইসিটি ডিভিশন নামক একটি নতুন ডিভিশন চালু করা হয়েছে। একটি অধিদপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯-এর নবায়নও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইতিবাচক কাজের মাঝে আরও অনেক কিছুর কথা বলা যাবে। তবে এ কথাটি সত্য যে ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য আমাদেরকে যেতে হবে অনেক দূর।

এজন্যই এই সময়ে আমরা আরও বেশ কিছু বড় উদ্যোগ আশা করেছিলাম। সবচেয়ে বড় যে উদ্যোগটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম সেটি হচ্ছে ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় আরও বেশি কর্মকাণ্ড। ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠায় আমরা একটি কাগজ বিহীন সরকারের কথা ভেবেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ যদি গড়তে হয় তবে সরকারকে কাগজবিহীন হতে হবে এই বিষয়ে কারও কোন সংশয়ও নেই। সরকার এ বিষয়ে সচেতন, এটি নিয়েও আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারের কাজ করার পদ্ধতির পরিবর্তনের জায়গাটি জেলা পর্যায়ের ওপরে ওঠেনি। আমরা এখনও একটি জাতীয় ডিজিটাল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারি নি। জেলা অফিসগুলো বেশ ডিজিটাল হয়েছে এবং আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করলেও বাংলাদেশ সচিবালয়ে আমরা ডিজিটাল কর্মকাণ্ড দেখতে চাই। সরকার এখন মাত্র সাতটি মন্ত্রণালয়কে ডিজিটাল করছে, আমরা চাই সব মন্ত্রণালয় ডিজিটাল হোক। দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠছে-আমরা চাই কাজটি আরও দ্রুত হোক। নেস তৈরি হচ্ছে। আমরা চাই এটি দ্রুত গড়ে ওঠুক। কিন্তু আমরা বহু চেষ্টা করেও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। প্রধান বিচারপতি নিজে বলেছেন যে, বিচার বিভাগের ডিজিটাল রূপান্তর আশাব্যঞ্জক নয়। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ডিজিটাল হবার পাশাপাশি ডিজিটাল অপরাধ প্রতিরোধের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের আইন চাই। এখনও এনবিআরও জয়েন্ট স্টক ছাড়া আর কোথাও ডিজিটাল সিগনেচার তেমনভাবে চালু হয়নি।

ফলে, যে কাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল রূপান্তর আমরা সরকারের সকল অঙ্গে দেখতে পেতে পারতাম সেটি এখনও সন্তোষজনকভাবে দেখিনি। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের কৌশলে তেমন কোন নতুনত্ব না আসায় এই খাত থেকে যে ধরনের আর্থিক সফলতা আসার কথা এবং যতোটা দ্রুত এই খাতের প্রসার ঘটার কথা-তা ঘটেনি। আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রতি এই শিল্পখাতের নজর ছিলো না। একই সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মেধাসম্পদ সুরক্ষার বিষয়টিও উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে। একদিকে আমরা জ্ঞানভিত্তিক সমাজের কথা বলছি, অন্যদিকে জ্ঞান সুরক্ষার কোন আয়োজন করছিনা। সরকার ও বেসরকারি উভয় খাতের জন্যই এটি এক ধরনের অবজ্ঞা ও বেঠিক রণনীতি ও কৌশল বলে আমি মনে করি। আমাদের একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমরা এখনও ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনে নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করতে পারিনি।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে: আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাই। তেমন একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি আমাদের বিদ্যমান উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি নতুন কিছু উদ্যোগ নেবার প্রস্তাব দিই। মনে রাখা দরকার যে, সরকার এই খাতে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেগুলোর বাইরে এই প্রস্তাবনা।

যদি আমরা আগামী দিনগুওলোতে তথ্যপ্রযুক্তিতে সামনে যেতে চাই তবে প্রথমত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে কেবলমাত্র সফটওয়্যার ও সেবাখাতের রপ্তানী ম্যানিয়াকে ধরে রাখলে চলবেনা। বরং সেই হুজুগকে বিদ্যমান অবস্থাতে রেখে ডিজিটাল ডিভাইস রপ্তানী এবং নিজের দেশের ভেতরে সফটওয়্যার-সেবা ও ডিজিটাল যন্ত্রের বাজারের দিকেও তাকাতে হবে। একই সাথে কেবলমাত্র সফটওয়্যার ও সেবাখাতের হুজুগটিকে ডিজিটাল যন্ত্র প্রস্তুতের দিকেও নিতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৯৭ সালে জেআরসি কমিটির রিপোর্ট পেশ এবং সেই বছরের ডিসেম্বরে দেওয়াং মেহতাকে নিয়ে সফটওয়্যার রপ্তানী বিষয়ক সেমিনার করার পর আমরা সবাই মিলে কেবলমাত্র সফটওয়্যার ও সেবাখাতের রপ্তানী নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। দেশের ব্রান্ডিং, হাইটেক পার্ক নির্মাণ ও জনসম্পদ গড়ে তোলা থেকে মেলায় মেলায় পথ চলা বা আইসিটির অন্য খাতগুলোতে আমরা কেবল সফটওয়্যার ও সেবাখাতকেই একতরফা প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। ১৮ বছর যাবত আমাদের এই প্রচেষ্টায় সফলতা একেবারে আসেনি সেটি বলা যাবে না। বিশেষ করে গত ৬ বছরে আমরা রপ্তানীর পথে অনেকটাই এগিয়েছি। ২০০৮ সালে আমরা এই খাতে যে পরিমাণ রপ্তানী করতাম সেটি এই কয়েক বছরে ১০ গুণ বেড়েছে। তবে যে পরিমাণ সময় এবং বিনিয়োগ এই খাতে আমরা করেছি সেই তুলনায় সফটওয়্যার ও সেবা খাতের অভ্যন্তরীণ বাজার এবং ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনে মনযোগী হইনি। রপ্তানীতেও আমাদের সফলতা আরও বেশি হতে পারতো।

আশির দশকে এদেশে ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনের সূচনা হয়। আমরা ভিসিপি-ভিসিআর, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি সংযোজন দিয়ে যাত্রা শুরু করে এখন এই খাতে উৎপাদক হিসেবে বেশ শক্ত অবস্থান তৈরি করেছি। এমনকি আমরা এখন স্মার্ট ফোন ও ট্যাবলেটও বানাচ্ছি। কিন্তু এতো সুযোগ থাকার পরও পিসি বা ল্যাপটপের উৎপাদনে কোন অবস্থান তৈরি করতে পারিনি। ৯৮-৯৯ সালে কম্পিউটারকে শুল্কমুক্ত করার পর দেশে ক্লোন পিসির বাজার সম্প্রসারিত হয় ব্যাপকভাবে। বেসরকারি খাতের প্রায় সকল গ্রাহকই ক্লোন পিসি কেনার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু বিপুল বাজার থাকা স্বত্ত্বেও একটি দেশীয় ব্রান্ড আমরা দাঁড় করাতে পারিনি। এজন্য আমরা যেমন দেশীয় উদ্যোক্তা পাইনি তেমনি সরকারের দেশীয় পিসি কেনায় অনাগ্রহ থাকায় এই খাতে আমরা কোন অগ্রগতি সাধন করতে পারিনি। আমাদের দেশীয় কম্পিউটার বিক্রেতারা বিদেশী ব্রান্ড বিক্রিতে যতোটা আগ্রহী ততোটা নিজের ব্রান্ড তৈরিতে নয়। সরকার টেশিস-এর মাধ্যমে দোয়েল পিসি বাজারজাত করার একটি অসাধারণ উদ্যোগ নিলেও সেটি সফল না হওয়ায় ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনে আমরা আরও পিছিয়ে পড়ি।

অথচ এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ডিজিটাল যন্ত্র ছাড়া ডিজিটাল সভ্যতা গড়ে ওঠবে না। আমরা সফটওয়্যার বা সেবা যাই করতে চাই তার জন্য ডিজিটাল যন্ত্র লাগবেই। এই বাজারটি সফটওয়্যার ও সেবা খাতের চাইতে ছোট এবং অগুরুত্বপূর্ণ সেটি মনে করার কোন কারণ আমি মনে করি না। এই খাতে ৯৮/৯৯ সালে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করেই আমরা দায় সেরেছি। যারা এর বাজারজাত করছেন তারাও আমদানীতেই মগ্ন থেকেছেন। আমরা কি ভেবেছি যে, আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা দিতে ডিজিটাল যন্ত্র

লাগবে বা অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প কল কারখানাকে ডিজিটাল করতে যন্ত্র লাগবে। এমনকি সফটওয়্যার ও সেবা খাতের বিকাশেও ডিজিটাল যন্ত্র লাগবে। একটু হিসেব করলেই দেখতে পাবো যে সফটওয়্যার ও সেবা রপ্তানীর বিপরীতে আমরা কি বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল যন্ত্র আমদানী করি। রপ্তানী বাড়ানো যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি আমদানী বিকল্প গড়ে তোলাও লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য বিদেশ থেকে সফটওয়্যার ও সেবা আমদানীর লাগাম টেনে ধরা দরকার। একই সাথে দেশে ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া দরকার। আমরা যেমন করে ক্লোন পিসি বানাই তেমন করে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন বানাতে পারি। যে পরিমাণ ডিজিটাল যন্ত্র আমরা বানাই তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা রপ্তানী করার কথাও ভাবতে পারি।

আমি মনে করি, এজন্য সরকারের উচিত কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া। প্রথমত ডিজিটাল যন্ত্রের যন্ত্রাংশ ও পুরো প্রস্তুত করা ডিজিটাল যন্ত্রের মাঝে মুল্য ও ভ্যাটের পার্থক্য করতে হবে। এর ফলে যন্ত্রাংশ আমদানী করে ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদন করায় যেমন আগ্রহ বাড়বে তেমনি দেশীয় যন্ত্রের উৎপাদন ব্যয় কম হবে। এজন্য সম্পূর্ণ উৎপাদিত কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও স্মার্ট ফোনে কর/ভ্যাট আরোপ করা যেতে পারে। একই সাথে দেশে উৎপাদিত হয় এমন সফটওয়্যার ও সেবার ওপরও কর/ভ্যাট আরোপ করা যেতে পারে। তবে বিদ্যমান কর সুবিধা যন্ত্রাংশ খাতে বহাল রাখা উচিত।

সরকার সফটওয়্যার ও সেবা খাতে যে কর সুবিধা দিচ্ছে সেটি ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনেও দিতে পারে। অন্যদিকে সরকারের উচিৎ দেশে উৎপাদিত ডিজিটাল যন্ত্র কেনার ব্যবস্থা করা।

কেবলমাত্র ব্রান্ড পিসি কেনার সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে সরে আসতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে মান যাচাই করা যেতে পারে-কিন্তু দেশীয় ডিজিটাল যন্ত্র কেনা হবেনা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে।

আমি প্রত্যাশা করি ২০২১ সালে আমরা ডিজিটাল যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সফটওয়্যার-সেবা খাত উভয় দিকেই একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতে পারি।

লেখক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর প্রণেতা ॥ ই-মেইল ঃ mustafajabbar@gmail.com, ওয়েবপেজঃ www.bijoyekushe.net

মানবদেহে পানি

ড. মুহম্মদ কবিরউল্যা

জলের অপর নাম জীবন এ প্রবাদ বাংলা ভাষায় বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত। জীবনের শুরু পানি হতে। জীবনের পরিসমাপ্তি পানিতে কিনা তা বিজ্ঞানীদের ভাববার বিষয়। জন্মের আগে মায়ের উদরে জীবন কাটে পানিতে। খাবার ব্যতিরেকে মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে কিন্তু পানি ছাড়া মানুষ কয়েক দিনের বেশী বাঁচতে পারে না। কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া অকসিজেন বাদেই জীবন ধারণ করে কিন্তু পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না। পৃথিবীর জন্মের সময়ই তাতে পানি ছিল। পানি বাষ্প দিয়ে এর আবহাওয়ার সৃষ্টি। পানি, এমোনিয়া ও মিথেন দিয়ে জীবনের শুরু এ তত্ত্ব আজ প্রমাণিত। পানি জীব কোষের প্রধান সাংগঠনিক বস্তু। জীব দেহের মধ্যে এক অঙ্গ হতে অন্য অঙ্গে এর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বহন করে পানি। পানি দিয়ে তৈরী হয় রক্ত। পানি ছাড়া জীবন কল্পনাতীত। পানি আমাদের এত প্রয়োজনীয় অথচ পানি সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই। কারণ প্রকৃতিতে পানি একটি অতি সহজলভ্য বস্তু। প্রাত্যহিক জীবনে কোন সহজ উপমার প্রয়োজন হলে আমরা বলি "পানির মত সহজ"। মোট কথা সহজলভ্য বলে আমরা পানিকে কোন প্রকার গুরুত্বই দেই না। অথচ পানি আমাদের জীবনের অংশ। পানি দিয়ে আমাদের জীবনের সৃষ্টি। পানি আমাদের জীবনের বাহন। নিম্নে জীবন ধারণে পানির অংশগ্রহণ সম্বন্ধে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করা হল।

তৃষ্ণা

মানব দেহে পানির প্রয়োজনীয়তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ তৃষ্ণা। তৃষ্ণা একটি অনুভূতি। নানাবিধ জটিল মেকানিজমের মধ্য দিয়ে তৃষ্ণা শরীরে পানির অভাব বোধের একটি সিগনালরূপে প্রকাশ পায়। তবে এ সিগনালে বাহ্যিকরূপ মুখ ও গলার শুষ্কতা। শরীর হতে আমরা নিয়তই পানি ছেড়ে দিচ্ছি প্রস্রাব, ঘাম ও নিশ্বাসের সথে বাষ্পাকারে। অন্য দিকে খাদ্যদ্রব্যের সাথে বা শুধু পানি হিসেবে খাওয়ার সাথে আমরা পানি গ্রহণ করি। আমাদের দেহ হতে প্রতিনিয়ত যে পানি বের হয়ে যাচ্ছে পানি গ্রহণ ও নিঃসরণের মাঝে একটি প্রাকৃতিক সমতা বিদ্যমান থাকে। এই সমতা যখন নিঃসরণের দিকে চলে, তখন আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি, প্রয়োজন হয় পানির।

তৃষ্ণার্ত অবস্থায় আমরা যদি পানি পান না করি, তাহলে আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং প্রাণাসায়নিক প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যায়ে মানুষ মারা যায়। আমাদের দেহ হতে প্রতিনিয়ত যে পানি বের হয়ে যাচ্ছে বা ক্ষয় হচ্ছে, তার প্রথম পর্যায়ে যখন দেহ থেকে শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ পানি বের হয়ে যায়, তখন আমরা অস্বস্তি বোধ করি। চোখে মুখে ফুটে উঠে পিপাসার্ত ভাব। এরপরের ধাপে যখন শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ পানি ক্ষয় হয়-তখন গলা, মুখ, চোখ ফুলে উঠে। মহিভ্রম হয়, এমনকি বিবস্ত্র হয়ে পড়ে। তৃতীয় ধাপে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ পানির ক্ষয় হলে চোখের পাতা শক্ত হয়ে পড়ে, মুখমন্ডল অসাড় বোধ করে। এরপর যখন ২০ ভাগের অধিক পানি নিঃসরণ হয়, তখন মৃতবৎ অবস্থার সৃষ্টি হয়। চামড়া ফেটে যেতে থাকে, রক্তপাত হয়। পঞ্চম ধাপে মৃত্যুর সাথে চলে যুদ্ধ এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। মরুভূমির শুষ্ক বালুকারাশিতে এরূপ ঘটা প্রায়ই দেখা যায়।

মানবদেহে পানির পরিমাণ

একজন সুস্থ সবল মানুষের দেহে কি পরিমাণ পানি রয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা একটু কঠিন। বিভিন্ন লেখক এ বিষয়ে নানা মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে সবার মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, মানবদেহে পানির পরিমাণ দেহে ওজনের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ। অর্থাৎ একজন মানুষের দেহের ওজন যদি ৬০ কিলোগ্রাম হয়, তাহলে তার দেহে অস্থিতে পানির পরিমাণ হবে ৩৬-৪২ কিলোগ্রাম। পানির পরিমাণের এই তারতম্য অনেক কারণে হয়ে থাকে। তবে এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে, দেহে চর্বির পরিমাণ ও স্বাস্থ্যাবস্থা। যাদের দেহে চর্বির পরিমাণ বেশী, তাদের দেহের আয়তন বেশী হলেও, দেহের ওজন কম। ফলে ওজন ভিত্তিক শতকরা হিসেবে পানির পরিমাণ বেশী দেখা যায়। আবার যাদের দেহ সুগঠিত, মেদহীন ও মাংসল, তাদের দেহের ওজন তুলনামূলকভাবে চর্বিযুক্ত মোটা দেহের তুলনায় বেশী হয় এবং শতকরা হিসেবে পানির পরিমাণ কম দেখা যায়। তাই দেহে পানির পরিমাণ দেহের ঘনত্ব অনুসারে হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ গড়পড়তা হিসেবে মানুষের দেহে পানির পরিমাণ ধরা হয় শতকরা ৬৫ ভাগ। মেয়েদের ক্ষেত্রে পানির পরিমাণ পুরুষের চেয়ে কম, প্রায় ৫২ ভাগ। দেহে অবস্থিত পানির দুই তৃতীয়াংশ থাকে কোষের অভ্যন্তরে ও এক তৃতীয়াংশ থাকে কোষের বাহিরে। কোষের বাহিরে পানি হল রক্ত ও পাকস্থলীতে অবস্থিত পানি। দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত পানির পরিমাণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

মস্তিষ্কে ৭৪.৫%

হাঁড় ২২.%

কিডনী ৮২.৭%

মাংসপেশী ৭৫.৬%

রক্ত ৮৩.০%

মানবদেহে পানির কাজ

মানবদেহের প্রধান সাংগঠনিক বস্তু হল পানি। প্রত্যেকটি কোষের গঠন প্রণালী ও কার্যক্রম সবই পানির দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানবদেহে দ্রাবক হিসেবে পানির কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পানি দেহের যাবতীয় পুষ্টি উপাদানের দ্রবক, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চলাচলের জন্য পিচ্ছিলকারক, দেহের তাপ নিয়ন্ত্রক, দেহে বিভিন্ন উপাদানের একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচলের পরিবাহক। পানির এসব বিচিত্র কাজের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাংগঠনিক উপাদান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। খাদ্রদব্য হতে এসব সাংগঠনিক উপাদান বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যায়। এসব উপাদান যাওয়া আসা করে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায়। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য হজম হবার পর বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বয়ে নেবার কাজ পানিই করে থাকে। পানি এসব পুষ্টি উপাদানকে দ্রবীভূত করে এবং দ্রবীভূত অবস্থায় আনা নেয়া করে। যে বস্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না, তা সোজা মল হিসেবে বের হয়ে আসে। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য হজম হবার সময় পানি মিডিয়া হিসেবে কাজ করে। খাদ্যদ্রব্যকে নরম করা, পাকস্থলীর একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে স্থানান্তর।

আমিষ+ পানি= এমিনো এসিড
শর্করা+ পানি= গুকোজ
গ্লীসারাইড+ পানি=ফ্যাটি এসিড+ গ্লীসারাল

খাদ্যদ্রব্যকে বয়ে নেয়া পানির কাজ। পাকস্থলীতে পানি চর্বি, শর্করা ও আমিষ মৌলকে জ্বলান্বিত করে বিভাজিত করে। অবশ্য এক্ষেত্রে এনজাইমসহ বহু প্রভাবক অংশগ্রহণ করে থাকে। পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশী। এজন্য প্রাণী দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণে পানি অত্যন্ত পারদর্শী। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পানি দেহের অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয়। সাধারণতঃ প্রতি দিন পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে আমাদের দেহ হতে প্রায় ৫০০ ক্যালরী তাপ নির্গত হয়।

তরল পানি	১১০০	বাষ্পীভবন	৯২০ -১০০০
কঠিন খাবারের সাথে	৫০০ -৯০০	পায়খানা	৮০ -১০০০
পরিপাকে উৎপন্ন	৪০০	প্রস্রাব	১০০ -১৩০০
মোট	২০০০ -২৪০০	মোট	২০০০ -২৪০০

টেবিল: ২৭: একজন মানুষের দৈনিক পানি গ্রহণ ও নিঃসরণ (মিলিলিটার)
পানি গ্রহণ-পানি নিঃসরণ।

পানি গ্রহণ, নিঃসরণ ও চাহিদা

মানুষ সাধারণতঃ তিনভাবে পানি গ্রহণ করে থাকে, যেমন তরল পানি, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অবস্থিত পানি ও দেহের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য পরিপাককালে সৃষ্ট পানি। অন্য দিকে একইভাবে দেহ হতে পানি বের হয়ে থাকে, চামড়া দিয়ে ঘাম হিসেবে, ফুসফুস হতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে, কিডনি হতে প্রস্রাবের আকারে, পাকস্থলীতে পায়খানার সাথে, চোখের জল হিসেবে, কাটা গেলে রক্ত হিসেবে। পানি নিঃসরণের পরিমাণ নির্ভর করে পানি গ্রহণ, স্বাস্থ্যাবস্থা, আবহাওয়া ও কাজকর্মের উপর। পানি গ্রহণ ও নিঃসরণের মাঝে রয়েছে একটি প্রাকৃতিক সমতা। টেবিল-২৭ এ পানি গ্রহণ ও নিঃসরণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। গড়ে একজন মানুষ দৈনিক প্রায় ২০০০-২৪০০ মিলিলিটার পানি গ্রহণ করে থাকে এবং একই পরিমাণ পানি বের করে দেয়। এ সমতা রক্ষা না পেলে দেহে পানি সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেবে। নিঃসরণের পরিমাণ গ্রহণের চেয়ে কম হলে শরীরে পানি শূন্যতা দেখা দেবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একজন মানুষ দৈনিক ক্যালরি হিসেবে যে পরিমাণ খাদ্য শক্তি গ্রহণ করবে, ঠিক সেই সংখ্যক পরিমাণ মিলিলিটার পানি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আবহাওয়া ও দৈনিক কাজকর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এ পরিমাণ কিছুটা বেশ কম হতে পারে। ঘুম, পড়াশুনা এবং বিশ্রামের সময় পানি নিঃসরণের পরিমাণ কম। তাই এ ধরনের কাজে ব্যাপৃত থাকলে পানি কম খরচ হয় এবং পানি গ্রহণের পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে খেলাধুলা বা কঠিন দৈহিক পরিশ্রমের কাজে পানি নিঃসরণের পরিমাণ বেশি, তাই তখন পানি গ্রহণের পরিমাণও বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাবক হল আবহাওয়া। শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্ম কালে পানি নিঃসরণের পরিমাণ বেশি।

নবজাতক শিশুর পানির চাহিদা

শিশুর পুষ্টি সাধনে আমিষের পর পানিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নবজাতক শিশুর দেহে তুলনামূলকভাবে পানির পরিমাণ থাকে বেশী। জন্মের সময় শিশুর দেহে পানির পরিমাণ থাকে প্রায় ৭০-৭৫%। এর মধ্যে ৭% রক্ত, ১৮% পাকস্থলীর পানি ও ৪৫% দেহ কোষের পানি। একটি শিশু দৈনিক তার দেহের ওজনের ১০-১৫% পরিমাণ পানি বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে যা মাত্র ২-৪%। অর্থাৎ সে জন্য শিশুদের স্বাভাবিক খাবার পানির পরিমাণ বেশী থাকে। সাধারণতঃ শরীর পাকস্থলী হতে প্রয়োজনমত পানি চুষে নেয়। কোষের ভিতর ও বাহিরের পানির মধ্যে একটা সমতা রক্ষার্থে পাকস্থলীর পানি দ্রুত পরিবর্তন হয়। অবশ্য এ প্রক্রিয়া নির্ভর করে আমিষ ও ইলেকট্রোলাইট এর ঘনত্বের উপর। বয়সের সাথে পানি গ্রহণের পরিমাণ বাড়ে। তবে দেহের আকার ও ওজন অনুপাতে অল্প বয়সে পানির চাহিদা বেশী থাকে। যেমন ৩ মাস বয়সী শিশুর দৈনিক পানির চাহিদা ৭৫০ মিলিলিটার এবং ১২ মাস বয়সে প্রায় ১৩০০ মিলিলিটার। একটি শিশু প্রতিদিন তার দেহে অবস্থিত পানির প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ বের করে দেয়। টেবিল-২৮ এ একটি নবজাতকের গড়পড়তা পানির চাহিদা দেখানো হয়েছে। ৩-৬ মাস বয়সে শিশুর দেহের ওজনের অনুপাতে পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশী থাকে। অবশ্য বয়স বাড়ার সাথে সাথে মোট পানির চাহিদাও ক্রমাগত বাড়তে থাকে।

বয়স	দেহের গড় ওজন (কেজি)	দৈনিক পানির মোট চাহিদা (মিলি)	দৈনিক পানির চাহিদা মিলি/কেজি ওজন
৩ দিন	৩.০	২৫০ - ৩০০	৮০ - ১০০
১০ দিন	৩.২	৪০০ - ৫০০	১২৫ - ১৫০
৩ মাস	৫.৪	৭৫০.৮৫০	১৪০ - ১৬০
৬ মাস	৭.৩	৯৫০ - ১১০০	১৩০ - ১৫৫
৯ মাস	৮.৬	১১০০ - ১২৫০	১২৫ - ১৪৫
১ বছর	৯.৫	১১৫০ - ১৩০০	১২০ - ১৩৫
২ বছর	১১.৮	১৩৫০ - ১৫০০	১১৫ - ১২৫
৪ বছর	১৬.২	১৬০০ - ১৮০০	১০০ - ১১০
৬ বছর	২০.০	১৮০০ - ২০০০	৯০ - ১০০
১০ বছর	২৮.৭	২০০০ - ২৫০০	৭০ - ৮৫
১৪ বছর	৪৫.০	২২০০ - ২৭০০	৫০ - ৬০
১৮ বছর	৫৪.০	২২০০ - ২৭০০	৪০ - ৫০

টেবিল-২৮: শিশুর পানির চাহিদা

খাদ্যদ্রব্যের নাম	পানির পরিমাণ (%)
দুধ	৮৭
ভাত	৮০
মাংস	৫৫
লেটুস শাক	৯৬
গোল আলু	৮০
কলা	৭৬
রুটি	৩৬
বিস্কুট	২৭
মাখন	১৬
পাতা জাতীয় শাকসব্জী	৮৫ - ৯৫
ফল	৮৫ - ৯৫

টেবিল-২৯: খাদ্য দ্রব্যে অবস্থিত পানির পরিমাণ

পানির উৎসঃ

মানুষের পানির প্রধান উৎস খাবার, খবার পরিপাকে উৎপন্ন পানি ও পানীয়। আমাদের খাদ্যদ্রব্যে প্রায় ৭০ ভাগ পানি থাকে। নিম্নে নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যে অবস্থিত পানির পরিমাণ উল্লেখ করা হল (টেবিল-২৯)। এছাড়া পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করার সময় অন্ত্রে পানি উৎপাদিত হয়। যেমন ১০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট বা শতর্করা হতে ৬০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম চর্বি হতে প্রায় ১১০ গ্রাম এবং ১০০ গ্রাম আমিষ হতে প্রায় ৪০ গ্রাম পানি উৎপাদিত হয়। এরপর বাড়তি পানির চাহিদা মেটাতে আমরা পানি পান করে থাকি।

ড. মুহম্মদ কবিরউল্যা
প্রাক্তন সদস্য (উন্নয়ন)
বিসিএসআইআর, ঢাকা।

বাংলাদেশের মিঠা ও লোনা পানির কচ্ছপ প্রজাতি

ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ

আমরা কম বেশি সকলেই কচ্ছপের সাথে পরিচিত। এ কচ্ছপ বা কাছিম Reptitlia শ্রেণীর মেরুদন্ডী প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত। এ কচ্ছপ আবার গুইসাপ, টিকটিকি, কুমির এর জাত ভাই। এরা চতুষ্পপদী, এদের ত্বকের বাইরের অংশ বহিস্তকীয় আঁশে (Scale) ঢাকা যা ত্বককে আঘাত এবং শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে। কাছিম ও কাউঠা দাঁতবিহীন ও মজবুত চোয়াল যুক্ত ও সাধারণত বর্মসদৃশ খোলক বিশিষ্ট নিরীহ প্রাণী। শক্ত বর্মাচ্ছাদিত খোলক অস্থিফলক দ্বারা গঠিত। কচ্ছপ বা কাছিম (Turtle) এর উপরের অংশকে ক্যারাপেস (Carapace) বলে– যা এদের পিঠ ও পাশকে আবৃত করে রাখে এবং নিচের প্লাসট্রোন (Plastron) নামে অভিহিত অংশ এদের উদরকে ঢেকে রাখে, আর বাকী দুই অংশ পাশকে সংযুক্ত করে। তবে ব্যতিক্রম হলো নিউগিনি অঞ্চলের ফলকহীন কাছিম এবং আমাদের বঙ্গোপসাগরে(Bay of Bengal) সচরাচর দৃষ্ট চর্মপৃষ্ঠ কাছিম যাদের দেহ পুরু অস্থিময় ত্বকে ঢাকা থাকে। ভীত-সন্ত্রস্ত হলে বেশির ভাগ কাছিমই তার গলা S আকৃতিতে ভাঁজ করে মাথাটি সোজা খোলকের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে। বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ ফুসফুসের সাহায্যে তাদের শ্বসনকার্য (Respiration) চালায়। এবং সকলেই ডাঙ্গায় বা উঁচুভূমিতে ডিম পাড়ে। এবারে অবতারণা করা যাক কচ্ছপের শ্রেণী বিভাগ, তাদের আবাস, গতিবিধি, খাদ্যাভ্যাস, পরিবেশগত অভিযোজন প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যাদি।

মিঠাপানি বা অল্প লোনাপানির কচ্ছপকে সাধারণত Terrapin বলা হয়, এদের মাংস ভক্ষণ করা হয়। এরা কয়েক সেন্টিমিটার থেকে ২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। স্থলবাসী প্রজাতি বিশেষ করে Testudinal গোত্রের সদস্যরা সাধারণত কাউঠা নামে পরিচিত। আর ক্ষুদ্রতম কচ্ছপ প্রজাতিকে দাগফুটকি কাউঠা নামে পরিচিত। খোলকের দৈর্ঘ্য ৯৫ মিমি এবং ওজনে প্রায় ১৪০ গ্রাম হয়। বৃহত্তম চর্ম কাছিমের (Leather trtle) খোলকের দৈর্ঘ্য ২.৫ মিটার পর্যন্ত হয় এবং ওজন সর্বোচ্চ ৮-৬ কেজি হয। পৃথিবীর উষ্ণমন্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে ১২টি গোলে (Family) বিভক্ত Testudines বর্গের এবং ৯০ গণের (Genus) ২৫০ প্রজাতির কাছিম ও কাউঠা রয়েছে। অধিকাংশ কছিমই প্রাচীনতম ধরনের এবং কালের বিবর্তনে এদের দেহ অবয়বের সামান্যই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে ৫ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ২৬ কচ্ছপ পাওয়া যায় । এদেরকে আবার অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক ভাগে বিভক্ত করা যায়। অন্তর্দেশীয় ২১ প্রজাতির মধ্যে ২০টি প্রজাতির কাছিম ও

কাউঠা নানা হুমকির সম্মুখীন, ৭টি প্রজাতি অতি বিপন্ন, ১১টি বিপন্ন ও ২টি বিপন্ন প্রায়। অতি বিপন্ন প্রজাতিগুলো হলো ঃ বড় কাউঠা (River Terrapin, Batagur baka) ধুর কাছিম, পাহাড়ী কাছিম পাহাড়ী হলুদ কাছিম, বোস্তামি কাছিম জাতা কাছিম এবং সিম কাছিম। ছবিতে তোমরা কচ্ছপকে দেখতে পাবে।

মাংসাশী ও জলচর কচ্ছপ (Turtle) যেমন, Lissenys punctala মাংসাশী সর্বভুক্ত প্রকৃতির (Carnivore) । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের কাঠামো (Ecosystem) সংরক্ষণে কচ্ছপ কীট প্রতঙ্গ ক্ষতিকর কীড়া শামুক, ধীরগতিসম্পন্ন কাঁকড়া, মরা জীবজন্তু কিংবা উহার ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। (হোসেন এবং সরকার, ১৯৯৫, Ecology and food habit of Indian proofed turtle, Kachua teata in Bangladesh, Dhaka Univ. *J. Biol sci*-4(1) : 19-24)

নিম্নের সারণীঃ ১-এ সম্যক অবগতির জন্য *Lissemys punctata* নামক এক জলচর কচ্ছপের পাকস্থলী থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ভক্ষণের একটি তালিকা প্রদত্ত হলো।
সারণী ১ : ৭টি Lissemys punctala কচ্ছপের (Consumed) পাকস্থলীর খাদ্য প্রকৃতির তথ্যাদি।

ক্রঃনং	ভক্ষণকৃত খাদ্যেরধরণ	বন্টন সংখ্যা	ঘটন সংখ্যার শতকরা হার (%)	পাকস্থলীর মোট ওজন	ভক্ষকৃত খাদ্যের সংঘটিত সর্ম্পকের শতকরা হার
০১	মাছের কাঁটা (Fish Bone)	২৫	৫০	১৯.৫	৫.৪৮
০২	ব্যঙের হার	১০	২০	৫.০	১.৪০
০৩	মুরগীর নাড়ীভূঁরি	৮	১৬	১২.০	৩.৩৭
০৪	জীব-জন্তুর ভগ্নঅংশ	৪২	৮৪	২৭.০	৭.৫৮
০৫	কাঁকড়ার পা	২৮	৫৬	২৪.৫	৬.৮৮
০৬	জলচর পতঙ্গ	৬	১২	১৭.৫	৪.৯২
০৭	কেঁচো (Metaphira Sp.)	২২	৪৪	৩৪.৫	৯.৬৯

সারণী - ১

কচ্ছপের বিবিধ অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তন্মধ্যে জলজ কীটপতঙ্গ এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর শুক্রকীট, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ভক্ষণ করে ইহা জলজ অভিযোজনে ০০০ সহায়তা করে যা পরিবেশ রক্ষায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া কচ্ছপ বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ শামুক এবং ক্ষতিকারক জীব খেয়ে ফেলে এবং এভাবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে এ একটি ছবিতে স্থলচর কচ্ছপ দেখা যাবে।

চিত্র: ১ কচ্ছপ (Lissemys punctala)

বিভিন্ন ঋতুতে যেমন গ্রীষ্মকালে বর্ষায় এবং শীতকালে নামক শামুক প্রজাতির ভক্ষণকৃত খাদ্যের ধরনের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো যথাক্রমে ১৫৩.১+১২.৪, ২১৫০+১৫০ এবং ৭২.০ ৫.৪ গ্রাম যা পরীক্ষালব্ধ ফলাফলে থেকে জানা গেছে ।

উলেখিত কচ্ছপ প্রজাতির উপর বন্দীদশায় ০০০ দেহের গড় ওজনের তুলনায় গরম বর্ষা ও শীত মৌসুমে যথানিয়মে ২১.০, ২৯.৫ এবং ৯.৯% খাদ্য ভক্ষণ করে। ০০০ এবং গবেষকদ্বয়ের মতে জলচর কচ্ছপ ০০০ হলো সর্বভুক্ত প্রকৃতির এবং বন্দীদশায় পালন করা যায়। এরা রাতের বেলায় তীরের (০০০) কাছাকাছি আসে এবং ক্ষয়িষ্ণু পদার্থ এবং অন্যান্য খাদ্যকে সাবাড় করে। তাছাড়া ইহা মাঝে মাঝে কতিপয় জীবকে জীবন্ত অবস্থায় খায়, পুকুরের তলদেশ থেকে গলিত ও দূষিত খাবার ও গৃহস্থালী উচ্ছিষ্ট গলধঃকরণ করে পরিবেশকে ভাল রাখে। আর একটি কথা না বললেই নয়, তাহলো বন্দীদশায় কচ্ছপকে পালন করাকালীন সময়ে তারা শুধুমাত্র জীবজন্তুর দেহের খাদ্য খেয়ে থাকে। তাছাড়া কচ্ছপের পছন্দের খাদ্য তালিকায় (Preferred food items) রয়েছে মুরগীর নাড়ীভুড়ি, মরা মাছ, বাগানের শামুক, Apple snail, কেঁচো প্রভৃতি। বন্দীদশায় এরা গাছ-পালা কিংবা গাছপালা থেকে তৈরী সরবরাহকৃত খাদ্য একেবারেই খায় না।

স্থলচর কচ্ছপ (Tortoise) তার খাদ্য স্থলের আবাসস্থল (Terrestieria) থেকে সংগ্রহ করে থাকে। অর্থাৎ জলচর এবং স্থলচর উভয় প্রকার কচ্ছপকে বাণিজ্যিকভাবে দেশীয় বাজারে বিক্রি করে এবং বিদেশে রপ্তানী করে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে চাষ করা সম্ভবপর। কেননা আমাদের দেশের হিন্দু এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় সামুদ্রিক কচ্ছপের মাংস খায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন থাইল্যান্ড, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, নেপাল প্রভৃতি দেশে কচ্ছপের সুস্বাদু খাবার হিসেবে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কচ্ছপ নিয়ে উপরোক্ত আলোচনা থেকে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু আমাদের দেশের রাজশাহীর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোদাগাড়ীর বিস্তীর্ণ চরে এক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ এবং ঘড়িয়ালের এবং চট্টগ্রামের পুন্যাত্মা বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারের বিরাট দীঘিতে বিরল প্রজাতির কচ্ছপের আবাসভূমি (Habitat) রয়েছে– তাই আমাদের সরকারী ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এদের সংরক্ষণে (Conservation) আমাদের গ্রামীণ ও শহরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই বিরল এবং বিপন্ন প্রজাতির এ কচ্ছপ সম্পদকে (Resource) বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং এ সকল কচ্ছপ পৃথিবী নামক গ্রহে সর্দপে পূর্বের ন্যায় বিচরণ করবে।

ড. খন্দকার নেছার আহ্‌মেদ
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা।

মানবদেহে অ্যামিনো অ্যাসিডের গুরুত্ব

এম এ ওহাব

মানুষের সুস্থদেহে জীবন ধারণের জন্য শারীরিক সচেতনতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে চিকিৎসক ও পথ্যবিদ্যাবিশারদগণ মানুষকে রোগ মুক্ত রাখতে এবং দেহের জন্য উপযুক্ত খাদ্য উপাদান নির্বাচনে বহুকাল আগে থেকেই চেষ্টা চালিয়ে আসছে। নানা ধরনের খাদ্য গ্রহণের ফলে মানবদেহে বিপাকীয় ও জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগের সৃষ্টি হয়। এগুলো দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন এবং রোগ মুক্ত রেখে যেমন দেহের শক্তি যোগাতে সাহায্য করে, পাশাপাশি অতিমাত্রার বা মাত্রাতিরিক্ত এসব উপাদান দেহের জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। বিজ্ঞানীদের সফল গবেষণা থেকে প্রতিনিয়তই এ ধরনের উপকারী উপাদান শনাক্ত এবং তার গুরুত্ব প্রকাশ হচ্ছে। মানবদেহে সৃষ্ট এমনই একটা উপাদান হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড। পরিমিত মাত্রায় এটি দেহের কার্যকারিতায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যামিনো অ্যাসিড এক ধরনের জৈব যৌগ। এটি প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত যা দেহ-কাঠামো সৃষ্টি বা জীবনের মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে পড়ে। জীববিজ্ঞানগত দিক থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগ যা অ্যামিন এবং কার্বোক্সলিক ফাংশন গ্রুপ নিয়ে গঠিত। এই যৌগের গঠনকারী মূল মৌলের মধ্যে রয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, পাশাপাশি ধরন অনুযায়ী অন্যান্য মৌল। প্রায় ৫০০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের কথা জানা যায়, যা বিভিন্ন ভাগে বিভিক্ত। ১৯ শতকের গোড়ার দিকে কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের আবিষ্কার হয়। ১৮০৬ সালে ফ্রান্সের রসায়নবিদ লুইস নিকোলাস ভ্যাকুলিন এবং পিয়ারি জেন রবিকুইট অ্যাসপ্যারাগাস বা শতমূলী জাতীয় উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের জৈব যৌগকে পৃথক করে তার নাম দেন অ্যাসপ্যারাজিন। অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে এটাই প্রথম আবিষ্কার।

এছাড়াও অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে সাইটিন ১৮১০, গ্লেসিন এবং লিউসিন ১৮২০ সালে আবিষ্কার হয়। এর পর বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের আবিষ্কার এবং এর কার্যকারিতা ও উপকারী দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলতে থাকে। ১৯০২ সালে ইমিল ফিচার এবং ফ্যাঞ্জ হোমিস্টার এই যৌগের আধুনিক কাঠামো নিয়ে নিশ্চিত ধারণা দেন। দেহে প্রোটিন যখন হজম হয় বা কাঠামোগতভাবে এটা ভেঙে গেলে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রিয়া নষ্ট হয় অর্থাৎ এটা পরিত্যাক্ত হয়। মানবদেহের কার্যকারিতায় কয়েক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। এ জৈব উপাদান দেহে যেসব ক্রিয়া সাধন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- সার অংশ দেহে শোষণের জন্য গ্রহণকৃত খাদ্যকে উপযুক্ত পর্যায়ে ভেঙে ফেলে
- দেহের বৃদ্ধি সাধন করে
- ক্ষয়প্রাপ্ত টিস্যুর প্রয়োজনীয় উন্নতিতে সাহায্য করে

- এছাড়াও দেহের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়াতেও অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার হয়ে থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিডকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়।
- ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড
- নন-ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড
- কন্ডিশনাল অ্যামিনো অ্যাসিড।

ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড

এ জাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের কার্যকারিতা বা অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া থেকে তৈরি হয় না। এটা খাদ্য থেকে তৈরি হয়। এজন্য আমাদের উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। নয় প্রকারের ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, এগুলো হচ্ছে: হিসটিডিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন লাইসিন, মেথিওনিন, ফেনিলালানিন, থ্রিয়োনিন, ট্রাইটোফ্যান এবং ভ্যালিন।

নন-ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড

নন-ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড বলতে যা বুঝানো হয়, তা দেহ-অভ্যন্তরেই তৈরি হয়। এমনকি এ জাতীয় বা উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করলেও দেহের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হয়। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো হলো: অ্যালানিন, অ্যাসপ্যারাজিন, অ্যাসপ্যারাটিক অ্যাসিড এবং গ্লুট্যামিক অ্যাসিড।

কন্ডিশনাল অ্যামিনো অ্যাসিড

স্বাভাবিক অবস্থায় দেহে কন্ডিশনাল অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন হয় না। তবে মানসিক চাপ, বিশেষ ধরনের অসুস্থতায় স্বস্তি আনতে বা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এ জাতীয় উপাদান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো হলো: আর্জিনিন, সাইটিন, গ্লুট্যামিন, টাইরোসিন, গ্লেসিন, অর্নিথিন, প্রোলিন এবং সেরিন।

এখানে একটি জরুরি বিষয় হলো আমাদের ইসেনশিয়াল এবং নন-ইসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড আলাদাভাবে গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। উপযুক্ত বা সুষমখাদ্য থেকেই দেহে এ প্রয়োজনীয় উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। সম্প্রতি গবেষকরা দেহের জন্য উপকারী অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকারিতার একটা বিশেষ দিক নিয়ে সুখবর জানিয়েছেন। যাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস রয়েছে এবং এ সমস্যা থেকে দূরে থাকতে বা এটা নিয়ন্ত্রণে রেখে

চলতে চান, তাদের জন্য এ জৈব যৌগটি অনেকটা ওষুধের মতোই কাজ করতে পারে। কিছু প্রাকৃতিক উপাদানই এ সাফল্য এনে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় এমন অনেক স্বাস্থ্যসম্মত ও উপযুক্ত খাদ্য থেকেই এসব উপকারী অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করতে

পারি। এভাবেই রক্তে চিনি বা শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখানে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রক্তে শর্করা বা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত অনেক ওষুধের মতোই এটা কাজ করতে পারে। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ডায়াবেটিসজনিত শারীরিক সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা পর্যবেক্ষণ

করেছেন, কীভাবে রক্তের গ্লুকোজের বিপাকীয় ক্রিয়া ঘটে। সেখানে দেখা যায়, ডায়াবেটিসের বিভিন্ন ওষুধ সেবনে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকলেও অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব নেই।

দেহে এ পুষ্টিদায়ক উপাদান ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম। তবে ডায়াবেটিসের জন্য বেশি কার্যকর হচ্ছে 'আর্জিনিন' যা আলফা অ্যামিনো অ্যাসিড হিসেবে পরিচিত। সুইজারল্যান্ডের রসায়নবিদ আর্নিস্ট স্কুলজি ১৮৮৬ সালে এই জৈব যৌগটি আবিষ্কার করেন। আর্জিনিন বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এ উপাদান হরমোন বা প্রাণরসকে উদ্দীপিত করে ইনস্যুলিন নিঃসরণ বাড়ায় এবং দেহের ইনস্যুলিনকে কাজে লাগাতেও সাহায্য করে। ঠিক এই একই ধরনের কাজের জন্য বাজারে অনেক ওষুধ রয়েছে, আর্জিনিন অনেকটা সেই ওষুধের মতোই কাজ করে। প্রমাণিত হয়েছে আর্জিনিন গ্লুকোজের মাত্রা কমানোর জন্য বিপাকীয় ক্রিয়াকে অন্তত ৪০% বাড়িয়ে দেয়। গবেষকরা মনে করেন, মূল পয়েন্ট যখন উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে, কাজেই এক্ষেত্রে আরো কার্যকর ওষুধ তৈরির বিষয়টি নিয়েই এখন ভাবতে হবে। নিয়মিত খাবারে আর্জিনিন সমৃদ্ধ উপাদানের পরিমাণ বাড়ালে রক্তে চিনির মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। আর এতে সন্দেহ নাই এটা সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটাবে। এছাড়াও যারা অ্যামিনো অ্যাসিড বা আর্জিনিন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম থাকে।

আমাদের দৈনন্দিন খাবারের অনেক কিছুতেই আর্জিনিন উপাদান রয়েছে। অধিকাংশ মানুষের জন্য আলাদাভাবে এ উপাদান গ্রহণের প্রয়োজন হয় না, স্বাভাবিক বা বিশেষ কিছু খাবার থেকে দেহে এটা পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয়। এর মধ্যে যেসব খাদ্যে এ উপাদান পর্যাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট পরিমাণে আছে সেগুলো হচ্ছে: প্রাণিজ উৎস হিসেবে গরুর মাংস, দুধ, পনির, দুগ্ধজাত অন্যান্য খাবার, স্যামন, টুনা মাছ, ডিম এবং অন্যান্য লাল মাংস। উদ্ভিদ উপাদান হিসেবে মৌসুমী সবজি, সোয়াবিন, সূর্যমুখী, কুমড়া, যবের গুড়া, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট এবং তিল। এছাড়াও নানা রকম খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত কিছু উপকরণেও অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে। এসব খাদ্য থেকে যে কোনো ব্যক্তি তার শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসক বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে দৈনন্দিন খাবার তালিকা তৈরি করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের গুণাগুণ যাচাই এবং মানবদেহে এর কার্যকারিতা ও উপকারী দিক নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

এম এ ওহাব
উপপরিচালক (ট্রেনিং), ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট
কমিউনিকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ডিভিশন
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

ক্ষুধা কি? ক্ষুধা ও অপুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী?

মোকাররম বিল্লাহ চৌধুরী

প্রায়শঃ মায়েদের অভিযোগ বাচ্চারা খেতে চায় না।
কেন? এবং এর প্রতিকার।
মোটা লোকদের ক্ষুধার প্রতি অনুভূতি কেমন থাকে।

ক্ষুধা কি ? খাওয়ার ইচ্ছা কি কি কারণে হয়? খাওয়ার ইচ্ছা কি কি কারণে হয় না? জানুন, তারপর অভিযোগ করুন।

ক্ষুধা হচ্ছে খাদ্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা অথবা জরুরী প্রয়োজন মনে করা। অন্য কথায় ক্ষুধা হচ্ছে সাধারণত পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্যের অভাবের অনুভূতি থেকে পাকস্থলীর মধ্যে সৃষ্ট এক প্রকার অস্বস্তিকর অনুভূতি । যা ঘটে সংবেদনশীল (ইন্দ্রিয় হতে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহনক্ষম) নার্ভের উদ্দীপনা হতে এবং পাকস্থলীর ভিতর শূণ্য অবস্থানের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে।

ক্ষুধা হচ্ছে অনেকগুলি বিভিন্ন পারস্পরিক ক্রিয়াশীল স্পষ্ট মাপযোগ্য প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়া। আমরা বুঝতে চাই না যে যেমন:-শরীরের ভৌত অবস্থান,পছন্দ,অপছন্দ, মনের ও দেহের চাহিদা, মন ও দেহের তৃপ্তি/পরিতৃপ্তির কারণে প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জলপ্রপাতের মত স্বতস্ফুর্ত প্রবাহমান প্রাণরাসায়ণিক রসায়ন পদার্থ ক্ষুধা নামক অনুভূতির জাগরণ ঘটায়। অতএব ক্ষুধা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক এবং দেহের স্পষ্ট প্রাণরাসায়নিক পদ্ধতি যার প্রত্যেকটির নিজস্ব কার্যকরী সমন্বিত ফল স্বরূপ। আংশিক জানা এবং অসম্পূর্ণ সমস্যা-সমাধান যা ক্ষুধার বহু দিকগুলিকে নির্দেশ না করে শুধু একটি দিককে নির্দেশ করে। এই না জানার কারণে নিজের অসহায়ত্বকে বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠে।

যাহোক, আমরা অনেকেই পাকস্থলীর এক বিশেষ অসন্তুষ্টি এবং ক্ষণিকের জন্য ক্ষুধার প্রবল যন্ত্রণা সম্বন্ধে অবহিত নই। এগুলো সম্বন্ধে জানা দরকার। আমাদের মস্তিষ্কের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র জায়গায় শক্তিশালী প্রাণরাসায়নিক সিস্টেম আছে যাকে বলা হয় হাইপোথেলামাস। হাইপোথেলামাসের একটি বিশেষ এলাকা যাকে বলা হয়'আরকিউয়েট নিউক্লিয়াস' যেখানের

সিগনাল নিয়ন্ত্রণ করে বিপাকীয় হার, ক্ষুধা এবং তৃপ্তি। 'আরকিউয়েট নিউক্লিয়াস' দুটো কোষ সম্বলিত। একটি কোষ নিউরোপেপটাইড ওয়াই (NPY)/ রিলেটেড প্রোটিন (AGRP) কোষ। ইহাই ক্ষুধার কোষ। যখন ইহা উদ্দীপ্ত হয় তখন আমরা ক্ষুধা অনুভব করি এবং আমাদের বিপাকীয় হার কমে যায়। অন্য কোষটির নাম POMC (প্রোঅপিওমেলানোকরটিন)। ইহা তৃপ্তি নির্দেশক কোষ। ইহা উদ্দীপ্ত হলে আমাদের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি পায়।

ঘ্রেলিন (Ghrelin) ও লেপটিন (Leptin) নামের দুটি হরমোন যথাক্রমে ক্ষুধার এবং ক্ষুধা নিবারক পরমতৃপ্তির কোষগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। ঘ্রেলিন পাকস্থলীতে উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছলে ক্ষুধার কোষগুলি চালু হয়। এবং পরিতৃপ্তির কোষগুলোকে বন্ধ করে দেয়। লেপটিন শরীরের চর্বিকোষ হতে উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছলে উহা পরিতৃপ্তির কোষকে চালু করে। এবং ক্ষুধার কোষকে বন্ধ করে দেয়। এটাই সুস্থ শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়া।

ঘ্রেলিন হরমোন: পাকস্থলীতে উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছলে ক্ষুধার অনুভূতি জাগে।

লেপটিন হরমোন: চর্বিকোষে উৎপন্ন হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছলে তৃপ্তির অনুভূতি জাগে।

ক্ষুধা এবং খাওয়ার প্রতি তীব্র আকাঙ্খা দুইটি ভিন্ন অনুভূতি। শরীর ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু খাওয়ার প্রতি আকাক্ষা মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ক্ষুধা একটি শরীরের হিতকর কাজ যা আমাদের মস্তিষ্ককে নির্দেশ দেয় যে এখনই খাওয়ার সময়। তীব্র আকংক্ষা সম্পূর্ণরূপে সবসময়ে ক্ষুধার উপর নির্ভর না করে রুচির উপর নির্ভর করতে মস্তিষ্ককে নির্দেশ দেয়।

আমাদের মস্তিষ্কে একটি Cupcake circuit আছে। আমরা Cupcake এর জন্য পূর্ববর্তী সংযোগের সূচনাকে অন্তর্নিহিত করতে পারি না। যা হয়েছিল আমাদের বাল্যকালে আমরা প্রথম যখন স্বাদ অনুভব করি। তখনই সাথে সাথে আমাদের অনুভূতি, পরিপাক ক্রিয়া এবং নিউরোরাসায়নিক স্ফুলিঙ্গের দ্বারা উদ্দিপ্ত হয়েছিল।

মস্তিষ্কের মেসোম্বিলিক এলাকায় আনন্দের অনুভূতি জাগ্রত হয়। Vagus স্নায়ু পাকস্থলীকে নির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে পাকস্থলীতে হজমিকারক অম্ল নিঃসরণ হয়। অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নিঃসরণ করে। যকৃতের কোষগুলি চিনি,চর্বি ও 'স্টার্চ'গুলিকে স্থান করে দিয়ে এগুলোর পরিপাক সম্পন্ন করে। যেহেতু সকল পদ্ধতিগুলো খুলে যায়, আমাদের মধ্য মস্তিষ্কে একটি সাধারণ, প্রাথমিক এবং অবচেতন ধারণাকে ধারণ করে অর্থাৎ Cupcake। জীবনভর একটি ভালবাসার বন্ধন যা সম্ভবতঃ আরামদায়ক, সম্ভবতঃ বেদনাদায়ক অধ্যায় শুরু হল।

ক্ষুধার পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে খাদ্যকে কাজে লাগানো উচিত। সুখবর হলো, যদি কেউ খাদ্যের পছন্দের সাথে পরিতৃপ্তির কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে ঔষধ হিসেবে কাজ করে এই সংবাদ সমস্ত শরীরের মধ্যে পৌঁছে দেয়। সঠিক খাদ্য (বিভিন্ন বাদাম) খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের হরমোনগুলি আমাদেরকে পরিতৃপ্তির অনুভবে

রাখবে। সাধারণ চিনি জাতীয় খাবার আমাদের শরীরের হরমোনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র তারবার্তার সংকেত রাখবে। তাতে করে আমরা ক্রমান্বয়ে ক্ষতিকারক খাদ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ব।

বাচ্চাদের বেলায় কি কি ভাবে বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলি প্রতিকারের উপায়ঃ

১। মন-মানসিকতাঃ পিতার শূক্রাণুর মাধ্যমে পিতার তখনকার সময়ের সুপ্ত অবস্থায় মনমানসিকতা, চিন্তা চেতনা নিয়ে মায়ের ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে।পরবর্তী পর্যায়ে মায়ের গর্ভে মায়ের তখনকার সময়ের মন মানসিকতার, চিন্তা-চেতনার সমন্বয়ে শিশু বাড়তে থাকে। শিশু জন্মের পর বিশেষ করে একবার ছয় মাসের পর এবং পরে দুই বৎসর পর পারিপার্শ্বিকতা থেকে কিছু গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে শিশু নতুন এক মন মানসিকতার চিন্তা চেতনা নিয়ে বাড়তে থাকে। হয়ত ভাবছেন এর সাথে শিশুর খাওয়ার সাথে সম্পর্ক কী?

লক্ষ্য করুন। যারা পরিশ্রমী বা শ্রমসমৃদ্ধ কাজ করে উপার্জন করে যেমনঃ- রিকশাওয়ালা, দিনমজুর তাদের প্রচুর খাওয়ার অভ্যাস থাকে এবং খাওয়ার মধ্যে কোন বাছাবাছি করে না। তাদের সন্তানেরাও খাওয়ার মধ্যে কোন বাছাবাছি করে না। কিন্তু অপরপক্ষে যাদের পিতা মাতারা খাওয়ার ব্যাপারে বাছাবাছি করে তাদের সন্তানেরাও খাওয়ার ব্যাপারে বাছাবাছি করে। অধিকাংশ সম্পদশালী লোকেরা নিজের সম্পদ অর্জনের জন্য এত ব্যস্ত সময় কাটায় যে সঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণমত উপযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করে। এতে করে ক্ষুধার প্রয়োাজনীয় হরমোন 'ঘ্রেলীন' নিঃসৃত হতে হতে একসময় নিঃসরণ হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

২) শিশু জন্মদানের সময় এবং শিশুর জন্মের পরে পিতা মাতার নিজেদের খাওয়ার ব্যাপারে সঠিক খাদ্য সঠিক সময়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩) অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক ও প্যারাসিটামাল ব্যবহারের ফলে বাচ্চাদের পাকস্থলীতে গ্যাস তৈরী হওয়ার ফলে পাকস্থলীতে খালি অনুভূত হয় না। তখন ঘ্রেলীন হরমোনের প্রবাহ ঠিকমত হয় না। পরিণামে ক্ষুধা অনুভূত হয় না। উপরন্তু অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক বাচ্চাদের শরীরে এমনকি বড়দের শরীরের অজানা বায়োলজীক্যাল লিভিং ফ্যাক্টর (Unknown biological living factor) কে নষ্ট করে দেয় যা বাচ্চাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন করার ক্ষেত্রে (বিশেষ করে সুষম খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়ায়) বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে।

প্রতিকারঃ অপ্রয়োজনীয়/ক্ষতিকারক এন্টিবায়োটিক ও প্যারাসিটামাল বিশেষভাবে বাধ্য নাহলে অথবা উপায়ান্তর না থাকলেই শুধু ব্যবহার করা উচিত। উক্ত ঔষধগুলি খেতে বাধ্য হলে উদ্ভুত সমস্যাগুলির সমাধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪) অভ্যাস

ক) মানসিকভাবে ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য কথা বার্তায়, কাজে কর্মে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অস্থিরতা পরিহার করে সুষম খাদ্য নির্বাচন করে নিয়মিত সঠিক সময়ের খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

খ) সময়মত খাদ্য গ্রহণ করা: ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে সময়মত না খাওয়া সময়মত খাওয়া ক্ষুধার অনুভূতির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে। সময়মত না খেলে ক্ষুধার প্রয়োাজনীয় হরমোন 'ঘ্রেলীন' নিঃসৃত হতে হতে একসময় নিঃসরণ হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কারণ কোষগুলো আর ঘ্রেলীন হরমোন নিঃসরণ করার জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

৫) পছন্দ- অপছন্দ

ক) আজকাল পরিবারে অনাবশ্যক ঠান্ডা পানীয় খাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যা পরিণামে ক্ষুধাকে নষ্ট করে। এগুলি যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত।

খ) ফাষ্ট ফুডের দোকানের বিভিন্ন ফ্লেভার (flavour) যুক্ত খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ ও খাওয়া গ্রহণ করায় অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছাকে বিলুপ্ত করে। ফাস্ট ফুড পরিহার করা উচিত।

৬) বাচ্চারা পিতামাতা/অন্যান্য গুরুজনদেরকে অণুকরণ করতে চায়। চাপ প্রয়োগ তাদের মধ্যে বিদ্রোহীভাব জাগ্রত করে। নিজেদেরকে পরিবর্তন করুন। বাচ্চাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৭) রাত্রের খাওয়ার পর মুখ পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। পরিষ্কার না করলে খাদ্য থেকে উৎপাদিত এসিড ক্ষুধার অনুভূতিকে নষ্ট করে এবং দাঁতের মাড়িকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পিতামাতা নিজেদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক, পাকস্থলীতে গ্যাস সৃষ্টিকারী খাওয়ার পরিহার করে সময়মত প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। বাচ্চারা তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাদের খাদ্য গ্রহণে কোন অভিযোগ থাকবে না।

মোটা লোকদের বেলায়

মোটালোকদের চর্বির কারণে লেপটিন হরমোন লেভেল বেশী থাকে। এই উচ্চ লেপটিন লেভেল এবং উচ্চ ইনসুলিন লেভেল ঘ্রেলিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ফলে ঘ্রেলিন হরমোন লেভেল কমে যায়। উচ্চ লেপটিন লেভেল পরিতৃপ্তির কোষগুলোকে অনুভূতিহীন করে দেয়। এবং নিম্ন ঘ্রেলিন লেভেল ক্ষুধার কোষগুলোকে অতিরিক্ত অনুভূতিশীল করে তোলে। যদিও ঘ্রেলিন লেভেল নিম্ন এবং লেপটিন লেভেল উচ্চ তবুও ক্ষুধার কোষ গুলো চালু থাকে এবং তৃপ্তির কোষগুলো বন্ধ থাকে। এটা দুর্ভিক্ষের সময়ও মানুষেরা অনুভব করে থাকে। মোটালোকদের পর্যাপ্ত চর্বি ভান্ডারে থাকা স্বত্ত্বেও তারা ক্ষুধা অনুভব করে। পরিণতিতে সর্বাগ্রে সচেতন (পরিজ্ঞাত) সংকেতগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ক্ষুধা এবং পরিতৃপ্তির কোষগুলো বলে না কখন একজন লোক ক্ষুধার্ত হয় এবং কখন পরিতৃপ্ত হয়। সাধারণ চিহ্ন হলো মোটা লোক প্রভাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হলে সে ক্ষুধা অনুভব করে না। সে প্রায় প্রাতঃরাশ বাদ দেয়। কিন্তু তার মস্তিষ্ক উপবাসের সংকেত দেওয়ার কারণে পরিপাক ক্রিয়া বন্ধ হয়ে থাকে। ফলে শরীরে চর্বির ভান্ডার অপরিবর্তিত থাকে।

মানুষের ঘুমের সাধারণ বৃত্ত ঠিক রাখার জন্য পর্যাপ্ত ঘ্রেলিন হরমোনের প্রয়োজন হয়। ঘ্রেলিনের পরিমাণ কম হলে কার্যকরী ঘুম না হওয়ার জন্য প্রাতে শরীরে ক্লান্তি অনুভব হবে। এই অবস্থায় লেপটিন হরমোন উৎপাদন ত্বরান্বিত হবে এবং ফলে 'বিপাকীয় হার' কমে যাবে। 'লেপটিন' হরমোন এবং 'ঘ্রেলিন' হরমোনের অসমতাই মোটা হওয়ার প্রধান কারণ।

ক্ষুধা ও অপুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী?

আমরা প্রত্যেকে কতক সময়ের ব্যবধানে ক্ষুধা অনুভব করি। ক্ষুধা হল শরীরের মধ্যে একরকম সংকেত যাতে আমাদের অনুভব হয় যে আমাদের এখনই খাওয়ার প্রয়োজন। আমরা শরীরের প্রয়োজন মিটানোর জন্য পরিমাণমত খাদ্য খাওয়র পর আমাদের শরীরে ক্ষুধার সংকেত অনুভব হয় না। আবার আমাদের পাকস্থলী খালি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুধার অনুভূতি থাকে না। যদিও ক্ষুধা ও অপুষ্টি পাশাপাশি একত্রে চলে তবুও ক্ষুধা ও অপুষ্টি একই নয়।

১) সঠিক স্বাস্থ্য এবং এর উন্নয়নের জন্য যে সব পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন বহুদিন যাবৎ সেগুলির অভাবজনিত কারণে অপুষ্টিতে ভোগে।

২) অপুষ্টিতে বহুদিন যাবৎ ভোগতে পারে ও স্বল্প দিনের জন্যও ভোগতে পারে এই অবস্থা মৃদুও হতে পারে অথবা মারাত্মকও হতে পারে। বেশী মারাত্মক হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বহুদিনের ক্ষুধা এবং অপুষ্টি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ। যে মানুষ সবসময় ক্ষুধার্ত থাকে তার ওজন কমতে থাকবে। শিশু বয়সে অপুষ্টিতে ভোগলে সেই শিশুর বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্ষুধা এবং অপুষ্টির কারণঃ

১) বহুদিন যাবৎ যথেষ্ট খাদ্যের অভাবে ক্ষুধা অনুভব করতে থাকবে এবং একসময় অপুষ্টিতে ভোগতে থাকবে।

২) পর্যাপ্ত খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও সঠিক পুষ্টিকর খাদ্য, ভিটামিন এবং খনিজের অভাবে অপুষ্টিতে ভোগতে হতে পারে।

৩) কিছু কিছু রোগ ও অবস্থার কারণে খাদ্যের পরিপাক ও খাদ্য ঠিকমত শরীরের অন্ত্রের মধ্যে শোষিত হয় না।

ক) Celiac রোগের জন্য অন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। এঈ সমস্যা গ্লুটেন নামক প্রোটিন দ্বারা চালিত হয়।

খ) Cystic fibrosis নামক শিশুদের এই রোগে পুষ্টির শোষণে সমস্যার সৃষ্টি করে। কারণ পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় অনুঘটকগুলিকে (এনজাইমগুলিকে) অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসরণে বাধা প্রদান করে।

বিশ্বে সাধারণ বহুল পুষ্টির ঘাটতি হল আয়রনের ঘাটতি। যে পুষ্টির অভাবে রক্তশূণ্যতা সৃষ্টি

হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে সমগ্র বিশ্বে দুইশত কোটি লোক তাহাদের খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন, ভিটামিন 'এ' এবং জিঙ্ক পায় না।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলি অনুধাবন করে অসুবিধাগুলি দূর করে সঠিক নিয়মাবলী ধৈর্যের সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পালন করতে পারলে বাচ্চাদের বেলায় এবং মোটা লোকদের বেলায় আর কোন অভিযোগ থাকবে না।

মোকাররম বিল্লাহ চৌধুরী
প্রাণরসায়নবিদ ও অনুজীববিদ
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফেলো বোর্ড অফ হেলথ শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ফেলো এফডিএ,মিনিয়াপুলিস, মিনেসোটা, যুক্তরাষ্ট্র ।

বাংলাদেশের সংবেদনশীল উপকূলাঞ্চল

ড. অরুণ কুমার লাহিড়ী

সূচনা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন হলো চলমান বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও নিরাপত্তা হুমকি। এ সমস্যা সৃষ্টির জন্য বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর শিল্প কর্মকাণ্ডই প্রধানত দায়ী। তাদের শিল্পকারখানা থেকে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্তকারী গ্রিনহাউস গ্যাসের ক্রমবর্ধমান উদগীরণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অথচ প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এ উষ্ণায়ন তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছিল, আর আজ তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু শিল্পোউন্নত দেশগুলোর কারণে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে উন্নয়নশীল স্বল্পোন্নত দেশগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার স্বল্পোন্নত (LDCs) দেশগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত, অথচ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে তাদের ভূমিকা অতি নগণ্য। ইংরেজি তিনটি 'M' (material, money and might) সমন্বিত শিল্পোন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এখনও প্রায় আগের মতোই গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে রত রয়েছে, কারণ, বৈশ্বিক উষ্ণায়নে তাদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হচ্ছে না, আর ক্ষতি হলেও তা মোকাবিলা করার মতো তাদের যথেষ্ট সামর্থ্য রয়েছে। ফলে তাদের উদাসীনতা অনুন্নত বিশ্বকে আরও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলাঞ্চলসমূহের উপর সবচেয়ে বেশি বিরূপ জলবায়ুগত প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। আর বিশ্বের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই এ উপকূলাঞ্চলে বসবাস করে। বিরূপ জলবায়ুগত পরিস্থিতির মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, প্রবল বৃষ্টিপাত, ভূমিধ্বস, বন্যা, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। এসব বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য বাংলাদেশের উপকূলভাগ সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং সংবেদনশীল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে এসব বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ২০০৭ সালের 'সিডর' এবং ২০০৯ সালের 'আইলা'র কথা এখনও মানুষ ভুলতে পারেনি, সাতক্ষীরা জেলায় 'আইলা'র কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা থেকে এখনও মুক্তি পাওয়া যায়নি। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন বাংলাদেশের নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে এবং নতুনভাবে প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত হতে হলে বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অহরণের এবং

গণসচেতনতা সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধে যে বিষয়গুলোর উপর তথ্যভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো হলো: (১) বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের ভূমিকা, (২) বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট, (৩) বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল এবং মনুষ্য নিয়ামক, (৪) বাংলাদেশের উপকূলীয় মনুষ্য প্রতিবেশ, (৫) বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যপুষ্টি গ্রহণজনিত দারিদ্র, (৬) বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর লিঙ্গানুপাত ও জন্মহার, (৭) বাংলাদেশের উপকূল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে খারাপ শিকার, (৮) বাংলাদেশের উপকূলীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি, (৯) বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রশাসনিক জেলা, এবং (১০) বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের উপসংহার।

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের ভূমিকা

বাংলাদেশের ৭২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গোপসাগরীয় উপকূল নিম্নাঞ্চলীয় ব-দ্বীপযুক্ত হওয়ার কারণে সুনির্দিষ্টভাবেই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য সংবেদনশীল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রায়ই এ উপকুল অঞ্চলে আঘাত হানে, ফলে দুর্দশার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটে এবং প্রতিবেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপকূলভাগের মোট আয়তন প্রায় ৩৯,৩০০ বর্গকিলোমিটার (দেশের মোট আয়তনের ২৭%) এবং ২৯ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ (জাতীয় জনসংখ্যার ২২%) এ ভঙ্গুর এবং সংবেদনশীল এলাকাতে বাস করে [১]। চিত্র ১ এবং ২-তে যথাক্রমে বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

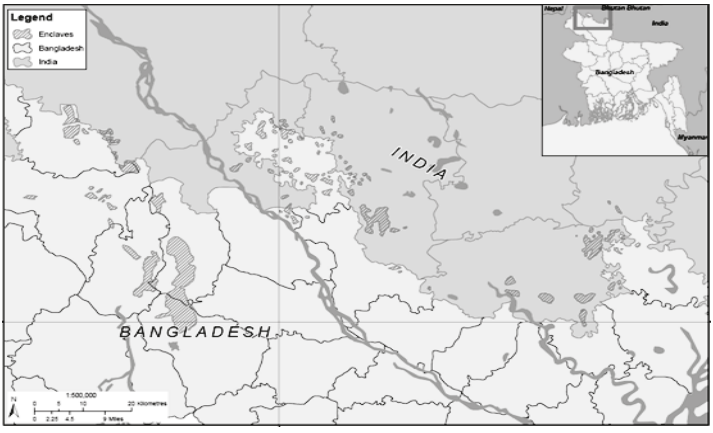

চিত্র ১এবং ২: বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ হলো বঙ্গোপসাগরের অন্যতম উপকূলীয় প্রান্তিক দেশ। বাংলাদেশের সবচেয়ে দক্ষিণাংশটি প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় রেখাঞ্চল (coastal belt) দিয়ে সীমারেখায়িত। এ উপকূলীয় রেখাঞ্চলের ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত প্রায় ৩৭, ০০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট মহাদেশীয় অংশ (continental shelf) বিদ্যমান।

বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলটি (Exclusive Economic Zone, EEZ) মূল ভিতরেখা থেকে ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র উপকূলীয় সমতল দ্বীপ (plain islands), প্লাবন সমভূমি (tidal flats), মোহনা (estuaries), সৈকতীয় ও অসৈকতীয় পানিমণ্ডল বাংলাদেশের উপকূল ভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এ উপকূল ভাগটির কিনারার দিকের বিস্তৃতি মহাদেশীয় অংশে প্রায় ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। বহু নদ-নদীর একটি বিশাল সংযোগ, একটি গতিশীল মোহনাতন্ত্র এবং একটি পানি নির্গমনশীল অববাহিকা অভ্যন্তরভাগ থেকে প্রবাহিত হয়ে উপকূলভাগটিকে ছেদ করেছে। ফলে উপকূলীয় প্রতিবেশকে বহুমুখী প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদজগৎ সমন্বিত প্রাকৃতিক সম্পদের একটি সম্ভাবনাময় উৎসে পরিণত করেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এসব সম্পদ বিশাল ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করে। এসব বহুমুখী প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের উপকূলভাগকে সাধারণভাবে নিচের তিনটি ভূতাত্ত্বিকগঠন অঞ্চলে (geo-morphological regions) বিভক্ত করা হয় [৪]:

(ক) পশ্চিমাঞ্চল: এ অঞ্চলটিতে সুন্দরবন নামক বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মধ্যাঞ্চল: এ মধ্যাঞ্চলটি পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অধিকাংশ সম্মিলিত জলধারা এ মধ্যাঞ্চলীয় নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। মেঘনা নদীর নিম্নাংশের মোহনা উচ্চমাত্রায় জোয়ারের অন্তঃক্রিয়ায় প্রভাবিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে উল্টো স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ লবণাক্ততা উজানে ধাবিত হয়। নদী বাহিত ভারি তলানির কারণে গঠনগতভাবে গতিশীল উপকূলাঞ্চল সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড় এবং ঝটিকা সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের ফলে এ উপকূলাঞ্চলের অধিকাংশ মারাত্মক ক্ষতিসাধন সংঘটিত হয়।

(গ) পূর্বাঞ্চল: এ পূর্বাঞ্চলটি ফেনী নদী থেকে বদর মোকাম নামক মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণাংশের চূড়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশটি কমবেশি অভঙ্গুর। কর্দমাক্ত ও বালুময় সমতল সৈকত হলো এ অঞ্চলটির বৈশিষ্ট্য। মাতামহুরী নদীর মোহনা এলাকায় ক্ষয়িষ্ণু প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল অর্থাৎ প্রাক্তণ চকোরিয়া সুন্দরবন এ অঞ্চলটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল এবং মনুষ্য নিয়ামক

গত ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের আয়তন হলো ৪৭,২১১ বর্গকিলোমিটার, যা বাংলাদেশের ভৌগলিক মোট আয়তনের ৩২%, এ এলাকার মধ্যে ৩৫ মিলিয়ন (৩ কোটি ৫০ লক্ষ) মানুষ অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ২৮% মানুষ ৬.৮৫ মিলিয়ন (৬৮.৫ লক্ষ) বাড়িতে বাস করে। বাংলাদেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলার মধ্যে ১৯টি জেলাই উপকূলীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। আইপিসিসি এর ২০০১ সালের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ২০% এবং ৪০% জনসংখ্যা যথাক্রমে উপকূলের ৩০ এবং ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাস করে, যা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে অতি সত্য। বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল শুধুমাত্র অতুলনীয় ভূতাত্ত্বিক ভৌত গঠনশৈলীর কারণে দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো থেকে ভিন্নতর নয়, উপকূলাঞ্চলের আরও অতুলনীয়ত্ব হলো ভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ফলাফলের কারণে প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ আহরণে এবং ঝুঁকি ও

সংবেদনশীলতা মোকাবিলাকরণে মানুষের ক্ষমতা প্রায়ই সীমিত হয়ে পড়ে। উপকূলাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সংবেদনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক কাছাকাছি, কারণ এক শ্রেণীর মানুষের জীবনধারণের পন্থা অন্যদের কাছে বিপদসংকুল দুর্যোগ হিসেবে গণ্য হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি অর্থাৎ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, ইত্যাদির ক্ষয়ক্ষতি সাধারণভাবে সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হলেও এসব দুর্যোগের মোকাবিলাকরণ ক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন হয়ে থাকে, কারণ মোকাবিলা করার ক্ষমতা সম্পদের মালিকানা ও প্রবেশাধিকারের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশি সংবেদনশীল, কারণ তাঁদের সম্পদগত ভিত দুর্বল এবং অপ্রতুল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র পর্যবেক্ষণ জরিপ প্রতিবেদন মতে দারিদ্র সৃষ্টি হওয়ার জন্য নিচে উল্লেখিত তিন ধরনের সংকট পরিলক্ষিত হয়ে থাকে [৪]:

(ক) মনুষ্য নিয়ামক (Human factor): মনুষ্য নিয়ামকের উদাহরণ হলো: সংসারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তির হঠাৎ মৃত্যু, রোগের চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়, ফসলহানি, সামাজিক বিবাদ, ইত্যাদি।

(খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural disaster): প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদাহরণ হলো: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, ইত্যাদি।

(গ) কর্তৃত্বের সংকট (Governance crisis): কর্তৃত্বের সংকটজনিত উদাহরণ হলো: আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি (ডাকাতি, অর্থ লোপাট, ছিনতাই, অবরোধ, মৃত্যুর হুমকি, মামলা খরচ, সরকারি খাস জমি দখল, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস যেমন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল উজাড় করা, প্রাকৃতিক সম্পদের অতি ব্যবহার, ইত্যাদি)।

বাংলাদেশের উপকূলীয় মনুষ্য প্রতিবেশ

উপর্যুক্ত মনুষ্য নিয়ামকের পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপকূলীয় মনুষ্য প্রতিবেশ বিপুলভাবে মনুষ্য নিয়ামক এবং দুর্বল কর্তৃত্বের হুমকির সম্মুখীন, ফলে উৎপাদনশীলতা এবং পণ্য ও সেবা বিতরণের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের আয় দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল। বিগত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে উপকূল অঞ্চলের গড় মাথপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) ছিল ২১,৩৭৯ টাকা, একই বছর উপকূল অঞ্চলের বাইরের অঞ্চলগুলোর গড় মাথপিছু মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল ২২,৬৮৪ টাকা। বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের ২৯% মানুষ চরম দরিদ্র এবং তাঁদের দৈনিক আয় ১ মার্কিন ডলারেরও নিচে [৫]। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী দীর্ঘ বছর ধরে গ্রামীণ বাংলাদেশের গড় কৃষি মজুরি হার ১ মার্কিন ডলারের নিচে বিরাজ করছে। উপকূলাঞ্চলের গড় মজুরি হার দেশের মোট গড় মজুরি হারের চেয়ে বেশি। উপকূলাঞ্চলের মধ্যে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির কৃষি মজুরি হার বেশি [৬]।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যপুষ্টি গ্রহণজনিত দারিদ্র

ক্যালরি গ্রহণমাত্রা বিবেচনায় দেশের উপকূলভাগের দারিদ্র দেশের অ-উপকূলভাগের দারিদ্রের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি। উপকূলাঞ্চলের পরিপূর্ণ (absolute) এবং চরম (extreme)

দারিদ্র হলো যথাক্রমে ৫২% এবং ২৪% এবং অ-উপকূল অঞ্চলের পরিপূর্ণ এবং চরম দারিদ্র হলো যথাক্রমে ৪৮% এবং ২২%। উপকূল অঞ্চলের গৃহস্থদের বিতরণ অবশ্য অ-উপকূল অঞ্চলের গৃহস্থদের বিতরণ থেকে ভিন্নতর। উপকূল অঞ্চলে খামারহীন গৃহস্থদের বিতরণ হলো ২৯.৬%, অথচ অ-উপকূল অঞ্চলে খামারহীন গৃহস্থদের বিতরণ হলো ৩৫.৫%। কিন্তু উপকূল অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা বেশি (৫৭.৭%)। দেশের অন্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা হলো ৫১%। বিগত ২০০১ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী উপকূল অঞ্চলের ৫৩.৫% মানুষ কার্যকরী ভূমিহীন (functional landless)। এই ৫৩.৫% মানুষ মাত্র ১৭% জমির মালিক, অন্যদিকে সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে ১২% মানুষ ৪৭% মোট ব্যবহারযোগ্য জমির মালিক [৪]।

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর লিঙ্গানুপাত ও জন্মহার

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের লিঙ্গানুপাত হলো ১০২ এবং অ-উপকূল অঞ্চলের লিঙ্গানুপাত হলো ১০৪। এ থেকে প্রতীয়মাণ হয় যে, উপকূল অঞ্চলে পুরুষদের বাইরে পরিযায়ী হয়ে গমনের মাত্রা দেশের অবশিষ্ট অ-উপকূল অঞ্চলের চেয়ে বেশি। উপকূল অঞ্চলে গৃহস্থ প্রতি গড় লোকসংখ্যা হলো ৫.০৮ জন। অথচ দেশের অবশিষ্ট অ-উপকূল অঞ্চলে গৃহস্থ প্রতি গড় লোকসংখ্যা হলো ৪.৭৭ জন। উপকূল অঞ্চলে জনমিতিগত নির্ভনশীলতার অনুপাত (demographic dependency ratio) হলো ১.০৬, অথচ দেশের অবশিষ্ট অ-উপকূল অঞ্চলের জন্য জনমিতিগত নির্ভনশীলতার অনুপাত হলো ১.০১। এমন পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ হলো শিশু ও বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্য। উপকূল অঞ্চলে ৪৬% জনসংখ্যার বয়স ১৫ বছরের নিচে। উপকূল অঞ্চলের জন্মহারও অবশ্য জাতীয় জন্মহারের গড় থেকে বেশি। বিগত ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে উপকূল অঞ্চলে গড় জন্মহার ছিল ১.২৯, এভাবে জন্মহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে উপকূল অঞ্চলের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫ মিলিয়ন (৪ কোটি ৫০ লক্ষ), ফলে আরও বেশি মানুষ ভূমিহীন হবে এবং আরও বেশি মানুষ জীবিকার জন্য শহরমুখী হবে। অধিকন্তু, ভিন্ন একটি জরিপের উপাত্ত থেকে পাওয়া যায় যে, উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান, গড় আয়ুষ্কাল, মাথাপিছু খামার জমি, শিক্ষালাভের সুযোগ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মৌলিক সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, ইত্যাদি জাতীয় গড় স্তরের চেয়ে নিম্নমানসম্পন্ন, তাছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বর্ধিত সংবেদনশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমান্বয়ে উপকূল অঞ্চলের মানুষকে আরও বেশি দুর্যোগের শিকার করে তুলছে [৪]। **চিত্র ১** এবং এতে যথাক্রমে বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের উপকূল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে খারাপ শিকার

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সবচেয়ে খারাপ শিকার। তাছাড়াও বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য হলো: ছাকন চোঙ্গাকৃতির (funnel shaped) অনেক নদীর সংযোগ জালিকা, প্রবল স্রোত ও বায়ুপ্রবাহের কার্যকলাপ এবং তলদেশের ও পানিতে ঝুলন্ত তলানিসহ নদীসমূহের বিপুল পরিমাণ জলরাশি অবমুক্ত হওয়ার স্থান। সুতরাং, বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর দিয়ে উপকূল অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক-জলবায়ুগত পরিবেশ প্রবলভাবে প্রভাবিত এবং প্রাকৃতিক দর্যোগের প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত নিচে উল্লেখিত তিনটি প্রধান নিয়ামকের প্রভাবে প্রভাবান্বিত [৪]।

(ক) বায়ুপ্রবাহের দিক (Wind direction),
(খ) বৃষ্টিপাত (Precipitation), এবং
(গ) নদী ও স্থলভাগের জলধারা (River and terrestrial run off)।

এ সবকিছুর সাথে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত উপকূল, প্রবল স্রোত ও বায়ুপ্রবাহ, গতিশীল ভূমিক্ষয় ও পললায়ন, প্রাকৃতিক মহাদেশীয় ঢাল, ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হওয়ার নীরব বৈশিষ্ট্য। বিগত ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত দারিদ্র পর্যবেক্ষণ

জরিপ অনুযায়ী উপকূল অঞ্চলে শনাক্তকৃত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো: ঘূর্ণিঝড়, নদীর পাড় ভাঙ্গন, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জলাবদ্ধতা, প্রবল বৃষ্টিপাত, ইত্যাদি এবং প্রধানত এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই উপকূল অঞ্চলের দারিদ্র সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পদ্ধতি

পল্লী অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম। সে সাংবিধানিক উদ্দেশ্যে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো, REB) কর্তৃক বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে স্থাপিত ২০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস/পিবিএস)-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়ে থাকে। উপকূলীয় ২০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নাম ও স্থান হলো: (১) কক্সবাজার পবিস, ঝিলংজা, কক্সবাজার, (২) চট্টগ্রাম পবিস-১, পটিয়া, (৩) চট্টগ্রাম পবিস-২, রাউজান, (৪) চট্টগ্রাম পবিস-৩, সীতাকুণ্ড, (৫) লক্ষীপুর পবিস, লক্ষীপুর, (৬) নোয়াখালী পবিস, বেগমগঞ্জ, (৭) ফেনী পবিস, মহিপাল, (৮) চাঁদপুর পবিস, হাজিগঞ্জ, (৯) ভোলা পবিস, বাংলাবাজার, জয়নগর, (১০) বরিশাল পবিস-১, রূপাতলা, (১১) বরিশাল পবিস-২, রহমতপুর, (১২) পটুয়াখালী পবিস, কালিকাপুর, (১৩) ঝালকাঠি পবিস, প্রতাপ, (১৪) পিরোজপুর পবিস, মরিচাল, হুলারহাট, (১৫) বাগেরহাট পবিস, পোলঘাট, মগরাহাট, (১৬) সাতক্ষীরা পবিস, পাটকেলঘাটা, (১৭) খুলনা পবিস, ঠিকরাবন্দ, (১৮) যশোর পবিস-২, মনিরামপুর, (১৯) গোপালগঞ্জ পবিস, কারারগাতী, এবং (২০) শরীয়তপুর পবিস, নরবালাখানা। অবশ্য আরও ৬টি উপকূলাঞ্চল সংলগ্ন পবিস হলো: (১) মাদারীপুর পবিস, মুস্তফাপুর, (২) ফরিদপুর পবিস, কানাইপুর, (৩) যশোর পবিস-২, তফসিডাঙ্গা, (৪) মুন্সীগঞ্জ পবিস, সিপাহীপাড়া, (৫) নারায়নগঞ্জ পবিস, নানাখী, সোনারগাঁ, এবং (৬) কুমিল্লা পবিস-১, চান্দিনা।

প্রত্যেকটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জন্য নির্দিষ্ট সদর দপ্তর ভবন, আবাসিক ভবন, উপ-দপ্তর, অভিযোগকেন্দ্র, পণ্যাগার, ট্রান্সফরমার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কারখানা/ওয়ার্কশপ বিদ্যমান আছে। সকল পবিস এর বিদ্যুৎ লাইনসমূহ ১১ কিলো ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন নিজস্ব উপকেন্দ্র থেকে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তারের মাধ্যমে সংযোজিত। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকে ১১ কিলো ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাহকদের (আবাসিক, বাণিজ্যিক, সেচ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধর্মীয়কেন্দ্র) কাছে বিতরণ করা হয়। উপকূলাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুপ্রবাহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, তাছাড়াও পানির স্রোত ও ঢেউ ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত

হতে পারে। উপকূলীয় বর্তমান বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা ঘূর্ণিঝড়ের প্রতি দারুণ সংবেদনশীল। প্রাতিবছর ঘূর্ণিঝড় হলে প্রতি বছরই নতুনভাবে ব্যয়বহুল বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করতে হয়। বিগত ২০০৭ সালের সিডরে ২৯টি পবিস-এর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তন্মধ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন পিরোজপুর পবিস-তে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,২০,০৯৬.৪১ মার্কিন ডলার, যা মোট ২৯টি পবিস এর ক্ষতির ৩৫.৭৪% [৭]। সে কারণে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত উপকূলাঞ্চলের স্থিতিশীল বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার জন্য ভবিষ্যতে প্রাথমিক খরচ বেশি হলেও বিশেষ স্থানগুলোতে যেমন নদী পারাপারে, ভূগর্ভস্থ লাইন নির্মাণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সহজে স্থাপনযোগ্য ও দুর্যোগের পূর্বে খুলে রাখার মতো সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার প্রচলনেরও পরামর্শ দেয়া হয়েছে [৭]।

বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রশাসনিক জেলা

সর্বমোট বাংলাদেশের প্রায় ৩৯,০০০ বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ২৭% আয়তনকে উপকূল অঞ্চল বলা হয় এবং এ অঞ্চলটি গ্রীষ্মমণ্ডলে ২১° থেকে ২৩° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৯° থেকে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত; সর্বমোট পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত এ অঞ্চলটির দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ৭১০ কিলোমিটার এবং এ অঞ্চলটির প্রশস্ততা হলো পশ্চিম দিকে সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটার এবং পূর্ব দিকে টেকনাফ মূল ভূখণ্ডের সর্বশেষ বিন্দুতে প্রায় ০ (শূন্য) কিলোমিটার [৮]। বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলটি মোট ১৯টি প্রশাসনিক জেলা নিয়ে গঠিত, উপকূলীয় প্রশাসনিক জেলাগুলো হলো: (১) কক্সবাজার, (২) চট্টগ্রাম, (৩) লক্ষীপুর, (৪) নোয়াখালী, (৫) ফেনী, (৬) চাঁদপুর, (৭) ভোলা, (৮) বরিশাল, (৯) মাদারীপুর, (১০) শরীয়তপুর, (১১) পটুয়াখালী, (১২) ঝালকাঠি, (১৩) বরগুনা, (১৪) পিরোজপুর, (১৫) বাগেরহাট, (১৬) খুলনা, (১৭) সাতক্ষীরা, (১৮) নড়াইল, এবং (১৯) গোপালগঞ্জ। উপকূলীয় জেলা সংলগ্ন অন্যান্য প্রান্তিক জেলাসমূহ হলো: (১) ফরিদপুর, (২) যশোর, (৩) মুন্সীগঞ্জ, (৪) নারায়নগঞ্জ, এবং (৫) কুমিল্লা।

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চলের উপসংহার

বাংলাদেশের উপকূলাঞ্চল যেমন অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের জন্য চরম হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ ফলাফলের প্রেক্ষিতে একদিকে এ অঞ্চলটির সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে এ অঞ্চলটির আয়তনও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এখন এ অঞ্চলটিকে যেখানে দেখানো হচ্ছে, আগামী কিছু বছর পরই অঞ্চলটি বিশেষ করে লবণাক্ততা নিয়ে আরও উত্তর দিকে সরে আসতে পারে, যা একটি উল্টো গতিধারা, কারণ আগের গতিধরাটি ছিল উপকূলভাগ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে সরে যাবে। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট দুর্গমতার কারণে অনুন্নত দেশের উপকূলভাগ অবহেলিত থেকে যায়। কারণ উন্নত দেশের ক্ষেত্রে দুর্গমতা সহজেই দূরীভূত হয়, সমুদ্রের মধ্যেও নতুনভাবে দ্বীপ ও নগর সৃষ্টি হয়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে উপকূলবাসী মানুষ ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক সহায়তায় (১) বিশাল প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ বাঁধ নির্মাণ, (২) বনভূমি উন্নয়ন, (৩) দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, (৪) নবায়নযোগ্য শক্তি/জ্বালানি সৃষ্টি, (৫) কর্মসংস্থানের জন্য

বিভিন্ন কাঁচামালের চাষ, যেমন উন্নত মৎস্য, হাঁসমুরগি ও গোবাদি পশুর চাষ; বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য, জৈব জ্বালানির জন্য ব্যাপকভাবে নারিকেল চাষ; খাদ্যপুষ্টি ও প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের রসের জন্য পেঁপে ও পেয়ারা চাষ; ইত্যাদি সৃষ্টি করার সুযোগ কাজে লাগানো প্রয়োজন। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালের শুরুতে কালবৈশাখী, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বজ্রঝড় হলো বাংলাদেশের স্বাভাবিক ঝড়-ঝঞ্ঝা। আর শীতকালে উপকূলভাগে সিডর, নার্গিস ও আইলার মতো সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হওয়া হলো অস্বাভাবিকতা। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে বলে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেলের (IPCC) অভিমত। পরিস্থিতি মোকাবিলা ও অভিযোজনের জন্য বাংলাদেশের উপকূলভাগে নিচে উল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং সে মর্মে উন্নতবিশ্বের কাছে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দাবি করা প্রয়োজন:

(ক) ব্যাপক বনায়ন: ব্যাপক বনায়নে নারিকেল গাছ ব্যবহৃত হলে দ্রুত ভূভাগ উঁচু হবে এবং নারিকেলজাত শিল্প সৃষ্টি হবে, ফলে এলাকাবাসী উপার্জনের জন্য শহরমুখী হবে না এবং বনভূমি উজাড়ায়ন রোধ হবে। ভারতের কেরালাসহ সমগ্র দক্ষিণভারত এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ নারিকেল শিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(খ) বাঁধ নির্মাণ: উপকূলভাগে এমনভাবে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে যাতে সহজেই জলোচ্ছ্বাসে সমুদ্রের নোনা পানি স্থলভাগে প্রবেশ করতে না পারে এবং স্বাভাবিক বর্ষা ও জোয়ার-ভাটায় নিচু স্থলভাগে দ্রুত পলি জমা হয়।

(গ) উঁচু পাড়যুক্ত জলাশয় খনন: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পর স্বাদু পানির চাহিদা মেটানোর সুবিধার্থে অত্যন্ত উঁচু পাড়যুক্ত কিছু জলাশয় নির্মাণ করার প্রয়োজন হবে। সুন্দরবনের পশুপাখির জন্যও এমন জলাশয় খনন করা প্রয়োজন।

(ঘ) ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা: নিয়মিত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রতি বছর নতুন করে বায়ব বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন (overhead power distribution line) মেরামত ও নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সেক্ষেত্রে শুধু উপকুলভাগে ও নদী পারাপারে যথাক্রমে ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ বিতরণ কেবল ও সাবমেরিন কেবল ব্যবহার করলে সেটিই হবে সবচেয়ে টেকসই ও লাভজনক উন্নয়ন [৭]।

(ঙ) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোতের ব্যবহার: উপকুলভাগে এসব শক্তির উৎস বেশি বলে যথাযোগ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য শিল্পোন্নত দেশের কারিগরি সহায়তা দাবি করা আবশ্যক।

(চ) স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র: উপকুলভাগে উঁচু বহুতল বিশিষ্ট স্থায়ী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং একই আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য, সম্পদ, ও গোসম্পদ মজুদকক্ষ নির্মাণ করা আবশ্যক।

তথ্যপঞ্জি

1. IUCN-BD (2009) Climate Change and Climate Variability in Bangladesh. International Union for Conservation of Nature-

Bangladesh (IUCN-BD), Website: www.iucnbd.org/
2. MoWR (2006) Coastal development strategy. Water Resources Planning Organizations, Ministry of Water Resources (MoWR), Government of People's Republic of Bangladesh, pp1, 4–5.
3. Alam, Mozaharul (2003) Brief Presentation on Bangladesh Country Case Study. Bangladesh Center for Advancement of Science (BCAS), Dhaka, PPt presentation in LDC NAPA Training Workshop, Thimpu, Bhutan, pp24.
4. Shamsuddoha, Md (2002) Climate Change Impact and Disaster Vulnerabilities in the Coastal Areas of Bangladesh. Coast Trust, Bangladesh, pp10. Websites: www.coastbd.org
5. World Bank (2003) World Bank Report-2003. Website: www.wb.org/
6. PDO-ICZMP (2003) Coastal Livelihoods: situation and context. Working Paper WPO 15.
7. Haque, S. M. Anamul (2010) Impact of Climate Change: Cyclone *SIDR* and Vulnerable Electricity Supplies in Coastal Part of Bangladesh- A Case Study. Ph. D. Thesis, Guided by Dr. Arun Kumar Lahiry, Atlantic National University, USA, pp214.
8. Pasha, Mostafa Kamal (2009) Bangladesh coastal ecosystem and its management. *In*: SOUVENIR, Annual Botanical Conference-2009, 9-10 January 2010, Chittagong University, pp 32-36.

ড. অরুণ কুমার লাহিড়ী
পরামর্শক, পরিবেশবিদ, গবেষক, লেখক, প্রাবন্ধিক।
প্রাক্তন টিম্বার প্রোডাক্টস স্পেশালিস্ট
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

আর্সেনিক ও আর্সেনিকের ব্যবহার

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্সেনিক (Arsenic) একটি বিষাক্ত মৌলিক পদার্থ। এর যেকোনো যৌগই বিষ (Poison) হিসেবে পরিচিত। তবে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগের মধ্যে স্বাদ ও গন্ধহীন সাদা-আর্সেনিক (White Arsenic) বা আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড (Arsenic tri-oxide) সবচেয়ে বেশি বিষাক্ত। একে 'বিষের রাজা' (King of Poison) হিসেবে অভিহিত করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে আর্সেনিকের ব্যবহার ও বিষাক্ততার নানা কাহিনি পাওয়া যায়। 'আর্সেনিক' শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে 'মৃত্যু'র সূচক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। বর্তমানে একে 'বিষ' শব্দটির সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবী সাহিত্যে আর্সেনিকের দুটি আকরিকের উল্লেখ রয়েছে। এ দুটি আকরিক হলো রিয়েলগার (Realgar) (রাসায়নিক নাম আর্সেনিক সালফেট) ও অর্পিমেন্ট (Oppiment) (উজ্জ্বল হলদে রঙের যৌগ)।

খ্রিস্টপূর্ব ৪থ শতাব্দীতে এরিস্টটল (Aristotle) এই ধাতুর নাম দেন সান্ডারওয়াচ, যার অর্থ 'লালমূল'। এরিস্টটলের শিষ্য থ্রিওফ্রাস্টাস ফিলিপাস অরিওলাস বোম্বাসটাস ফন হোহেনহাইম (Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim) এই যৌগের নাম দেন আরহেনিকাম (Arhenicum)। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ডিসকোরাইড আর্সেনিক সালফাইড খনিজের নাম দিয়েছিলেন 'আর্সেনিকাম' (Arsenicum)। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ধাতু নিয়ে কর্মরত আধুনিককালের গবেষকগণ সাদা আর্সেনিক খনিতে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট নয় বলে ধারণা করেন। তাঁদের মতে, এলকেমিস্টরা সাদা ও হলুদ বর্ণের খনিজের মিশ্রণে যে ধাতু মিশ্রণ তৈরি করতেন, তার নাম 'আর্সেনিকাম' (Arsenicum)। বর্তমানে একে অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাচীন ভারতে বুদ্ধ শাসনামলে আর্সেনিকের ব্যাপক ব্যবহার ছিল বলে বিভিন্ন সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে। 'চরক-সংহিতা' নামক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থে অর্পিমেন্টকে 'হরিটালা' এবং রিয়েলগারকে 'মানাশিলা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো দেহের বাইরের অংশ ও দেহের ভেতরের অংশের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আর্সেনিক সালফাইড আকরিক ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত।

পারসিয়ান	এজ-জারনিক
প্রাচীন পারসিয়ান	জারানিয়া
আর্মেনিয়ান	জারিক
সিরিয়ান	জারনিকি
ইহুদী	জানিং বা সোনালি

এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যে সাদা আর্সেনিকের আরো অনেক নাম দেখা যায়, যেমন সংস্কৃত 'শঙ্খ' ও 'সাবালা সারা', হিন্দিতে 'সানবুল-খার', 'সাম্মাল খার', শাঙ্খীয় সানবুল ও 'সাকিহিয়া' এবং বাংলাতে 'শঙ্কু বা 'সেনকু'। গ্রিক দার্শনিকদের বর্ণনায় দেখা যায়, মিশরীয় ও আরবি এলকেমিস্টরা আর্সেনিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তাঁরা মনে করতেন এই খনিজ পদার্থকে কপারের মতো সাদা রঙে পরিণত করা যায়। তাঁরা এটিও বিশ্বাস করতেন যে, তামাকে রূপায় পরিণত করা সম্ভব। প্রাচীনকালে আরো বিশ্বাস ছিল, অর্পিমেন্ট নামক খনিজ পদার্থে প্রচুর পরিমাণে সোনা আছে, তাই তাঁরা একে 'অরোপিগমেন্টাম' (auropigmentum) নামে অভিহিত করতেন। রাজা ক্যালিগুলা অর্পিমেন্ট থেকে চমৎকার খাঁটি সোনা তৈরি করেছিলেন বলে কোনো কোনো সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এক্ষেত্রে উৎপাদিত সোনার পরিমাণ ছিল খুবই কম ও ব্যয়ের তুলনায় প্রাপ্তি ছিল খুব নগণ্য পরিমাণের। এতে আরো উল্লেখ রয়েছে, যেসব অর্পিমেন্ট থেকে সোনা তৈরি করা হতো, সেগুলো সিরিয়ার নিকটবর্তী মাটিতে পাওয়া যেত। এগুলো অনেকটা সোনালি বর্ণের এবং আয়নানির্মিত শিলার ন্যায় অত্যন্ত ভঙ্গুর।

চিত্র ১: থিওফ্রাস্টাস ফিলিপাস অরিওলাস বোম্বাসটাস ফন হোহেনহাইম

তবে এলকেমিস্টরা আর্সেনিক নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, সে সম্পর্কে নানা ধরনের প্রমাণ রয়েছে। তাঁরা আর্সেনিককে বোঝানোর জন্য চিত্র ২-এ উল্লেখিত প্রতীকটি ব্যবহার করতেন।

চিত্র ২ : এলকেমিস্টরা আর্সেনিক বোঝাতে যে প্রতীক ব্যবহার করতন

বিখ্যাত রোমান সম্রাট ডিওক্লেটিয়ান (Emperor Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, ২৪৫-৩১৩) অর্পিমেন্ট খনিজ পদার্থ থেকে সোনা তৈরি করার জন্য এলকেমিস্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

চিত্র ৩: সম্রাট গেইয়াস অরেলিয়াস ভেলেরিয়াস ডিওক্লেটিয়ান

কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও এলকেমিস্টরা এতে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এতে সম্রাট ডিওক্লেটিয়ান অ্যালকেমিস্টদের উপর প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেন এবং রেগে গিয়ে আর্সেনিকবিষয়ক গবেষণামূলক সব মূল্যবান গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলেন এবং গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ করে দেন।

চিত্র ৪: গবেষণাগারে কর্মরত এলকেমিস্ট

শুধু তা-ই নয়, অর্পিমেন্ট থেকে সোনা তৈরি, কপারকে সাদা রঙে পরিণত করা, তামাকে রূপাতে পরিণত করা এবং লোহা ও টিন দিয়ে সোনা রং তৈরির করার কোনো পদ্ধতিও নবম শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ম্যাপা ক্লেভিকিইলা'তে পাওয়া যায়নি।

চিত্র ৫: জার্মান পন্ডি ও এলকেমিস্ট এলবার্টুস ম্যাগনাস

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে, ধাতু হিসেবে আর্সেনিক আবিষ্কারের পুরো কৃতিত্বের দাবিদার জার্মান পন্ডিত ও এলকেমিস্ট এলবার্টুস ম্যাগনাস (Albertus Magnus, 1193-1280)।

তিনি রসায়ন বা এলকেমি বিষয়ে তাঁর প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ-এ আর্সেনিক যৌগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে, কিভাবে সাবানের সাথে অর্পিমেন্টকে উত্তপ্ত করার মাধ্যমে আর্সেনিক ধাতু তৈরি করা যায়। লেখক বার্থোল্ট (Bertholt)-এর মতে, প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জসিমাস প্রথম, তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে ধাতব আর্সেনিককে 'দ্বিতীয় পারা' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। একে পোড়ান হলে যা পাওয়া যায়, তাকে 'রঙের আত্মা' নামে চিহ্নিত করেন।

চিত্র ৬: গবেষণাগারে কর্মরত অ্যালকেমিস্ট জাবির

আরবি এলকেমিস্ট জাবির ইবনে হাইয়ান (Abu Musa Jabir ibn Hayyan) ৮ম শতাব্দীতে সালফার আকরিক থেকে যে আর্সেনিক তৈরি করেন তা ধাতব আর্সেনিকের স্থান লাভ করতে পারেনি। ধারণা করা হয়, ১৩শ শতাব্দীতে পশ্চিমদেশীয় এলকেমিস্টরা প্রথম আর্সেনিক তৈরি করেন এবং এ ধর্ম এন্টিমনির মতো বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে প্রস্তুতকৃত আর্সেনিককে তাঁরা 'জারজ ধাতু' বলতেন।

১৬৪১ সালে ক্রোডার তাঁর Pharmacopia গ্রন্থে আর্সেনিয়াস অক্সাইডের সাথে কয়লার বিজারণ প্রক্রিয়ায় ধাতব আর্সেনিক তৈরির প্রণালি জানান। পরবর্তীকালে লেমেরি সাবান ও পটাশের সাথে আর্সেনিয়াস অক্সাইড পুড়িয়ে ধাতব আর্সেনিক তৈরি করেন। ১৭৩৩ সালে ব্রান্ড প্রথম আর্সেনিকের রাসায়নিক ধর্ম বিশদভাবে পরীক্ষা করেন এবং সাদা আর্সেনিক যে ধাতু আর্সেনিকের অক্সাইড তা প্রমাণ করেন।

১৭৭৫ সালে স্কেলে (Scale) নামক বিখ্যাত সুইডিশ রসায়নবিদ প্রথম আর্সিন গ্যাস আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই গ্যাসের তীব্র (acute) জীবাণু নাশক বিষাক্ততার কথা তাঁর একেবারেই জানা ছিল না। মিউনিকের প্রখ্যাত অধ্যাপক রসায়নবিদ পেলের প্রশ্বাসের সাথে সামান্য পরিমাণে বিশুদ্ধ আর্সিন গ্যাস গ্রহণ করার কারণে তার মৃত্যু ঘটলে এরপর থেকে এ গ্যাসের জীবননাশক বিষাক্ততার বিষয়টি জানা যায়। যতদূর জানা যায়, ১৮০০ শতাব্দী থেকে এ ধাতু-যৌগের পৃথকীকরণের কাজ চলে আসছে।

যাহোক, আর্সেনিক একটি স্বাদ ও গন্ধবিহীন বিষাক্ত খনিজজাতীয় বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ। এটি পর্যায় সারণির ৩৩তম মৌল।

চিত্র ৭: পর্যায় সারণিতে আর্সেনিকের অবস্থান

প্রকৃতিতে সুষমভাবে প্রচুর আর্সেনিক পাওয়া যায়। এক হিসাবে জানা যায় যে, প্রতি কেজি ভূ-ত্বকে (Earth Crust) প্রায় ২ মিলিগ্রাম পরিমাণ আর্সেনিক রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, বায়োস্ফিয়ারে শিলা গঠনের প্রধান ৮টি মৌল যথা- অক্সিজেন, সিলিকন, এলুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সালফার ও ম্যাগনেশিয়াম ছাড়া অন্য সব মৌলই ট্রেস মৌল হিসেবে ধরা হয়। যেসব মৌল প্রকৃতিতে ০.১%-এরও কম মাত্রায় অবস্থান করে, তাদের ট্রেস মৌল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আর্সেনিক বায়ু, জল, মাটি ও বিভিন্ন প্রাণীর দেহে খুব সামান্য পরিমাণ থাকে। মানবদেহেও সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক রয়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক ও রোম সাম্রাজ্যে একসময় এটি 'সেকোঁ বিষ' হিসেবে সমধিক পরিচিত ছিল। তৎকালীন চিকিৎসক ও গুপ্ত হত্যাকারীরা এই বিষ ব্যবহার করেই কোনো লোককে হত্যা করত। তবে সব ক্ষেত্রেই আর্সেনিকের গুরুত্বপূর্ণ যৌগ আর্সেনিক সালফাইড-ই ব্যবহার করা হতো। গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্রাধিক্য পরিমাণে আর্সেনিক দেহে গৃহীত হলে ত্বক, রক্তনালি, বৃক্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে।

দীর্ঘদিন অধিকমাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণ করলে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গে ক্যান্সার, স্নায়ু বিকলাঙ্গ, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। কথিত আছে, বিশ্বজয়ী ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের দেহে এই আর্সেনিক বিষ ধীরে ধীরে প্রয়োগ করে হত্যা করা হয়েছিল। আর্সেনিক বিষে এ ধরনের অসংখ্য মর্মান্তিক অজ্ঞাত মৃত্যুর ঘটনা যুগে যুগে ঘটেছে। এসব নিয়ে অনেক কাহিনি রয়েছে। আর্সেনিক দুষ্ট মাটি থেকে উদ্ভিদ পর্যাপ্ত পরিমাণ আর্সেনিক পুঞ্জীভূত করতে পারে। আর্সেনিক দুষ্ট ভূ-গর্ভস্থ শিলা ও মাটি থেকে ভূ-গর্ভস্থ জল ও উদ্ভিদে আর্সেনিক বিষাক্ততা লাভ করে খাদ্য শৃঙ্খল দূষিত করে তোলে।

সাধারণত পুকুর, নদী-নালার জলের তুলনায় সমুদ্রের জলে অধিক পরিমাণে আর্সেনিক থাকে। উচ্চতর প্রাণিদেহে প্রায় ৮৫% জৈব আর্সেনিক থাকে বলে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। জলে আর্সেনিক থাকলেও জলের স্বাদ বা বর্ণে তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। ফলে জল আর্সেনিকদুষ্ট কি-না সহজে অনুধাবন করা যায় না।

চিত্র ৮ : আর্সেনিক মৌল

ভ-ত্বকীয় শিলায় সালফার ও অন্যান্য ধাতু যেমন Mn, Fe, Co, Ni, Ag, ev Sn-এর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় আর্সেনিক পাওয়া যায়। ১৪০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আর্সেনিকের ঘনত্ব ৫.৭২৭ গ্রাম/ঘন সেন্টিমিটার। কঠিন আর্সেনিক ৬১৩০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। স্বাভাবিক বায়ুর চাপের চেয়ে ৩৬ গুণ অধিক চাপে আর্সেনিক উত্তপ্ত করলে ৮১৭০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কঠিন আর্সেনিক তরল হয়। মৌলিক অবস্থায় আর্সেনিকের বর্ণ অনেকটা ধূসর বা টিন রঙের মতো হয়। জলে এটি সহজেই দ্রবীভূত হয়।

চিত্র ৯ : খনিতে প্রাপ্ত আর্সেনিক

আর্সেনিকের যোজনী ৩ ও ৫। নলকূপের জল সাধারণত অজৈব ত্রিযোজী (৩+) এবং পঞ্চযোজী (৫+) আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আর্সেনিক একটি ধাতব পদার্থ। আগেই বলা হয়েছে ভূ-ত্বকে আর্সেনিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ধাতব পদার্থ চারটি যোজনী অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। যথা- ৩, ০, +৩ এবং +৫। প্রাকৃতিক পরিবেশে সাধারণত আর্সেনিক মৌল ও আর্সিন (-৩) হিসেবেই আর্সেনিক পাওয়া যায়। আর্সেনিক ও এর বিভিন্ন যৌগ সাধারণত কেলাসিত, পাউডার, আর্দ্র ইত্যাদি রূপে পাওয়া যায়। তবে এটি মূলত ট্রেস মৌল হিসেবেই প্রকৃতির বুকে অবস্থান করে থাকে। সাধারণ বিভিন্ন ধরনের পাথর, মাটি, জল ও বায়ুতে এটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পারিবেশিক বা মানবসৃষ্ট কারণেও কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যেতে পারে। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কাজের মধ্যে খনি খনন, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রজ্জ্বলন ও কীটনাশক ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করা যায়।

আর্সেনিক্যাল লবণ পিএইচ ও আয়োনিক পরিবেশ সাপেক্ষে জলে ভালোভাবে দ্রবণ তৈরি করতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন এক্ষেত্রে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ নানাভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অনেককাল আগে বিভিন্ন ধাতুর উপর প্রলেপ দেয়ার কাজে আর্সেনিক ব্যবহার করা হতো। কোনো কোনো দেশে আর্সেনিক্যাল-তামার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যে সময়ে এটি ব্যবহৃত হতো, তাকে আর্সেনিক্যাল-তামার যুগ বলা হয়। তবে বর্তমানকালেও এর ব্যবহার খুব একটা কম দেখা যায় না। আর্সেনিকের ব্যবহার বিভিন্নভাবে আলোচিত হতে পারে। এই প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্নভাবে আর্সেনিকের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

ক. আর্সেনিক ব্যবহার : যুগে যুগে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর্সেনিক প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ - এই তিনটি ধাপে আর্সেনিকের ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

ক. প্রাচীন যুগ

- খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ বছর আগে ঘর-বাড়ি বা অন্য কিছু রং করার জন্য আর্সেনিক ব্যবহৃত হতো।
- খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ বছর আগে থেকেই আয়নার তলদেশে রূপার প্রলেপ হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহার করা হতো।
- খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০ বছর আগে গবাদি-পশুকে খাওয়ানো হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে গবাদি-পশু মারা যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে আর্সেনিক যে বিষাক্ত পদার্থ, তা প্রমাণিত হয়।

খ. মধ্য যুগ

- হলুদ আর্সেনিক ওষুধ শিল্পে বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের কাজে, হজম শক্তি বাড়ানো, দেহের উষ্ণতা সংরক্ষণ করা, অতিরিক্ত চর্বি হ্রাস করা, হাঁজল রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হতো
- হলুদ আর্সেনিক বিভিন্ন রঙের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হতো।
- লেখার কালি হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হতো।
- কৃত্রিম সোনার অলংকার তৈরির কাজে আর্সেনিকের ব্যবহার সুবিদিত।

গ. আধুনিক যুগ

- কৃষিক্ষেত্রে পোকা-মাকড় দমন, কাঠ সংরক্ষণ, বাকল ছড়ানো, মাটি নির্বীজক হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।
- পশু-পাখির ফিড এডিটিভ, রোগ প্রতিরোধক, গবাদি পশুর খাদ্য সংরক্ষণ ও শৈবালনাশক হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।
- ওষুধ শিল্পে সিফিলিস, ট্রাইপানোসোমিয়াসিস, এমিবিয়োসিস, ঘুম রোগ প্রভৃতির প্রতিরোধক ওষুধ উৎপাদনে আর্সেনিক ব্যবহার করা হয়।

- ইলেকট্রনিকস শিল্পে সৌরকোষ, অটো ইলেকট্রনিকস ডিভাইস, সেমিকন্ডাক্টর, আলো নির্গমন প্রভৃতি কাজে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।
- বিভিন্ন কারখানার পণ্য উৎপাদনে যেমন কাচের জিনিস, রঞ্জক পদার্থ, সাবান, ব্যাটারি, ধাতু ও সিরামিক শিল্পে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।

এ ছাড়াও আর্সেনিকের প্রধান প্রধান যৌগ সংকর ধাতু সৃষ্টি, রং ঝালাই যন্ত্র, ব্যাটারি তৈরি, বিদ্যুৎবাহী ধাতব বস্তু তৈরি, ইলেক্ট্রোফটোগ্রাফ তৈরি, সৌর কোষ তৈরি, শাক-সবজি ও ফলবাগানের কীটনাশক, জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ গাছের বাকল ছড়ানো উদ্ভিদনাশক, ছত্রাক-নাশক, ইস্পাত ক্ষয়রোধক, মশার লার্ভানাশক, বঁড়শির টোপ প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হয়। এদিক থেকে আর্সেনিক বর্তমানকালেও একটি মূল্যবান ধাতু হিসেবে বিবেচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বর্তমানকালেও আর্সেনিকের ব্যবহার যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে বা ফুরিয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। কম বা বেশি নানাভাবেই এখনও মানুষের বিভিন্ন কাজে আর্সেনিকের ব্যবহার এখনও চলছে। এখানে সংক্ষেপে আর্সেনিকের ক্ষেত্রভিত্তিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক. চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহার

১. চর্মরোগ, বিভিন্ন ধরনের ঘা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, সিফিলিস, বহুমূত্র, জ্বর, অপুষ্টি, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আর্সেনিকের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়।

২. ১৭৮৬ সালে চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আর্সেনিকের ব্যবহার (ফাউলার দ্রবণ)-এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ঘটনার মাধ্যমে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার বিষয়টি চিকিৎসকরা স্পষ্টভাবে জানতে পারেন এবং এরপর থেকেই আর্সেনিকের ব্যবহার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে।

৩. বর্তমানে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আর্সেনিক-এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।
তবে বেশ কয়েক ধরনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আর্সেনিকভিত্তিক ওষুধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে এখনও আর্সেনিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

চিত্র ১০: হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আর্সেনিকের ব্যবহার
তবে আর্সেনিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ওষুধের বোতলে ঠিকই 'বিষ' কথাটির উল্লেখ থাকে।

খ. বিষ হিসেবে ব্যবহার

মারাত্মক বিষ হিসেবে আর্সেনিকের ব্যবহার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই জানত। ওয়াটার লু যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরেজরা ফ্রান্সের পরজিত সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়। নির্বাসন কালে নেপোলিয়নকে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৮২১ সালের ৫ই মে তাঁর মৃত্যুর পর ইংরেজরা ঘোষণা করে দিল যে, সম্রাট নেপোলিয়ন পাকস্থলীর ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু গোপনে খবর রটেছিল যে, ইংরেজরা সম্রাটকে দীর্ঘদিন ধরে মৃদু বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে হত্যা করেছে। পরে জানা যায়, এসময় তাঁকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, সেই ঘরে কিছু দিন পর পর হোয়াইট ওয়াশ করা হতো, যাতে আর্সেনিক মেশানো থাকত। এই আর্সেনিক থেকে যে গ্যাস বের হতো, তা-ই নেপোলিয়নের দেহে সঞ্চিত হতে থাকে। ইংরেজরা প্রথমে এ তথ্য অস্বীকার করে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর সংগ্রহশালায় রক্ষিত নেপোলিয়নের চুল পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল যে, নেপোলিয়নকে বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হয়েছিল এবং এ বিষটির নাম আর্সেনিক। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় জানা যায়, নেপোলিয়নের চুলে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে প্রায় ১৩ গুণ বেশি আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল।

চিত্র ১১: সম্রাট নেপোলিয়ন

বাংলাদেশেও আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল। গাজীপুর জেলার ভাওয়াল রাজার আকস্মিক মৃত্যু। ভাওয়াল রাজা দীর্ঘদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে সুচিকিৎসা তথা শারীরিক ও মানসিক চাপ কমানোর জন্য স্ত্রীকে নিয়ে দার্জিলিং-এ গমন করেন। সেখানে রাজার স্ত্রী তাঁদের পারিবারিক ডাক্তারের কুপরামর্শে ওষুধের সাথে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে রাজাকে পান করান। এতে রাজা তাৎক্ষণিকভাবে আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে মৃতের মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় কুচক্রী ডাক্তার রাজাকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করে। হিমালয়ের পাদদেশের এ স্থানটি ছিল মেঘাচ্ছন্ন ও খুবই দুর্যোগপূর্ণ। এরই মধ্যে তাড়াহুড়ো করে দাহ করার জন্য রাজাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্মশানে পৌঁছার পর পরই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। ঝড়-বৃষ্টি এতোটাই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, রাজার শ্মশানগামী সবাই রাজাকে শ্মশানে ফেলে ফিরে আসতে বাধ্য হয় এবং রাজার মৃতদেহ

পোড়ানো হয়েছে বলে মিথ্যা ঘোষণা দেয়। এদিকে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টিযুক্ত শৈত্যপ্রবাহে রাজার দেহের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং রাজার মৃত্যুবৎ আচ্ছন্নতা ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার হলে একদল পাহাড়ী নাগা সন্ন্যাসী শ্মশান থেকে আস্তানায় ফেরার সময় মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সন্ন্যাসীরা রাজার শব পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত জীবিত জেনে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। সন্ন্যাসীদের পরিচর্যায় রাজা জ্ঞান ফিরে পেলেও তাঁর পূর্ব স্মৃতি লোপ পেয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসীদের নিবিড় পরিচর্যায় ধীরে ধীরে রাজা সুস্থ হয়ে উঠেন। সন্ন্যাসীদের সাথে দীর্ঘদিন কাটানোর পর ভাওয়ালের রাজা সন্ন্যাসী বেশে নিজ দেশে ফিরে আসেন। ভাওয়াল রাজের মৃত্যু হয়েছে এটাই ছিল প্রচার। সন্ন্যাসীর বেশে মৃত ভাওয়াল রাজের আকস্মিক আবির্ভাব সবাকেই তাক লাগিয়ে দেয়। পারিবারিক সূত্রে অনেকেই রাজাকে চিনতে না পারলেও রাজার বোন ও তাঁর পোষা হাতি রাজাকে চিনতে পারে। এ নিয়ে একটি মামলা হয়। দীর্ঘ ১২ বছর প্রিভিউ কাউন্সিলে মামলা চলার পর রাজা তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট জ্যাকারি টেইলর (Zachary Taylor, 1784- 1850) কে আর্সেনিক বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তিনি ১৮৫০ সালের ৯ই জুলাই নিজ অফিস কক্ষে মারা যান। তাঁর খাদ্যে আর্সেনিক বিষ মেশানো হয়েছিল বলে অনেকেই সন্দেহ করেন।

চিত্র ১২: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জ্যাকারি টেইলর

তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিষ প্রয়োগের কথা স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি মেনে নেওয়া হয়। শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত ব্রিটিশ বিয়ের 'স্ট্যাফোর্ড সিয়ের বিয়ার' (Stafford Shire Beer) পান করে ৬,০০০ হাজারের বেশি লোক আর্সেনিক আক্রান্ত হয়। অনুসন্ধান করে জানা যায়, কলকারখানায় উৎপাদনজনিত ত্রুটির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ব্রিটেনের ইতিহাসে সম্ভবত মেরি আন কটনের (Mary Ann Cotton) নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকবে। কারণ চার চারবার বিয়ের আসনে বসা এই ৪০ বছর বয়েসী প্রাক্তন নার্স আর্সেনিক প্রয়োগ করে তিলে তিলে ঠান্ডা মাথায় সবচেয়ে বেশি লোক হত্যা করেছিলেন।

চিত্র ১৩: মেরি কটন

স্বামী ফ্রেডেরিকের সাথে ১৮৭১ সালে মেরি কটন কাউন্টি ডারহ্যামের পশ্চিম অকল্যান্ডে (West Auckland) যান। সাথে নিয়ে যান তার দুজন সৎ পুত্র এবং নিজের একমাত্র শিশু সন্তানকে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার দুই মাসের মধ্যে স্বামী মাত্র ৩৯ বছর বয়সে হঠাৎ করেই মারা যান। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেন যে, ফ্রেডেরিক গ্যাস্ট্রিক জ্বরে আক্রামন্ত হয়ে মারা গেছেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই মেরির এক প্রেমিক জোসেফ ন্যাটরাস (Joseph Natrass) তার বাসায় লজিং নিয়ে থাকতে আসেন। এরই মধ্যে মেরি এলাকারই একজন এক্সাইজ কর্মকর্তা কুইক ম্যানিং (Quick Manning)-এর ঔরসের সন্তান গর্ভে নেন। এর মধ্যে ১৮৭২ সালে ১০ই মার্চ থেকে ১লা এপ্রিলের মধ্যে মেরির বাসার আরো তিনজন সদস্য মারা যান। এরা হলেন ন্যাটরাস, মেরির নিজের সন্তান এবং মেরির প্রয়াত স্বামীর বড় ছেলে, যার বয়স হয়েছিল মাত্র ১০ বছর। একই বছরের ১২ই জুলাই মেরির স্বামীর অন্য ছেলেটিও মারা যায়। যে ডাক্তার এই শিশুটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা দায়িত্বে ছিলেন, তিনি শিশুটির মৃত্যু-সনদ দিতে রাজি হলেন না।

কিন্তু ডাক্তার এতে কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করলেও একই বাড়িতে অস্বাভাবিক এতগুলো মৃত্যুর বিষয়টি চোখে পড়ে এক প্রতিবেশীর। তিনি এতে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেন। এক পর্যায়ে তিনি স্থানীয় পুলিশের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। পুলিশ মৃতদেহের ময়নাতদমত্ম করার জন্য পাঠাল। ময়নাতদন্তে পরীক্ষকরা দেখতে পেলেন যে, মৃতের পাকস্থলীতে আর্সেনিকের উপস্থিতি রয়েছে। পুলিশ কটনের বাড়িতে ইতোপূর্বে মৃত দুই ব্যক্তির দেহ কবর থেকে তুলে ময়না তদন্ত করাল। তাদের দেহেও আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল। বোঝা গেল, আর্সেনিকই এসব মৃত্যুর মূল কারণ। মেরি কটনকে এসব মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলো এবং তাকে ডারহাম কারাগারে প্রেরণ করা হলো। সেখানেই তিনি কুইক ম্যানিং-এর গর্ভজাত সমত্মান প্রসব করেন। ১৮৭৩ সালে অনুষ্ঠিত বিচারে মেরি নিজেকে নির্দোষ হিসেবে

দাবি করলেন। তিনি এর সপক্ষে জানালেন যে, তার সৎ পুত্র বাড়িতে লাগানো সবুজ ফুলের ওয়ালপেপারে লাগানো আর্সেনিক দিয়ে আকস্মিকভাবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কিন্তু মেরির সব যুক্তি অসার প্রমাণ করে দিল বিচারালয় এবং তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলো। ১৮৭৩ সালের ২৪শে মার্চ তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হলো।

বিচারের বিভিন্ন প্রমাণে জানা যায়, মেরি কটনের পরিবারে ২০ বছরে ৩১ জন ব্যক্তির অস্বাভাবিকভাবে মারা যায়, যার মধ্যে ১৪ থেকে ১৫ জনের মৃত্যু সরাসরি তার কারণেই হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। আরো তথ্য-প্রমাণে জানা যায় যে, মেরি অ্যান কটন এই সময়ে নিজের মা, নিজের চার স্বামী, একজন বন্ধু, নিজের সব সন্তান, বেশ কয়েকজন সৎ পুত্র-কন্যাকে হত্যা করেন। এসব হত্যাকান্ড তিনি সেসময়ে প্রচলিত 'গ্যাস্ট্রিক ফিভার' (Gastric fever) নামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত এক ধরনের রোগ হিসেবে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। কিন্তু কেন এতো হত্যাকান্ড? সূত্র খুঁজতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারেন জীবন বীমার টাকা পাওয়ার জন্য বা নতুনভাবে বিয়ে করার জন্যই মেরি এসব হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে।

এদিকে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মধ্যযুগে আত্মহত্যা বা কাউকে হত্যা করার জন্য সর্বোত্তম প্রক্রিয়া হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহার করা হতো। এই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা হলে, লোকে ধারণা করা হতো যে রোগী নিউমোনিয়ায় মারা গেছে! ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার এলাকায় বিয়ার কারখানায় সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতির জন্য যে লৌহ আকরিক ব্যবহার করা হতো তা ছিল আর্সেনিকসমৃদ্ধ। এ সালফিউরিক এসিড গুকোজ প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা হতো। সাম্প্রতিককালে মালয়েশিয়ার ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের উপর আর্সেনিক বিষ প্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। জানা যায়, তিনিও আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় প্রাণ দিয়েছেন।

গ. কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার

দীর্ঘদিন ধরেই কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যত্র কীটনাশক হিসেবে, ইঁদুর, আগাছা ও পোকামাকড় দমনের কাজে অজৈব আর্সেনিক্যাল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন দেশে পরিচালিত গবেষণা ও তথ্য থেকে জানা যায়, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৭৫% আর্সেনিক্যাল ব্যবহৃত হয়। বিশেষত লেড আর্সেনেট, ক্যালশিয়াম আর্সেনেট, সোডিয়াম আর্সেনেট ও জৈব আর্সেনিক্যালের উৎপাদনের কাজে আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড (Arsenic tri-oxide) সরাসরি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর্সেনিক এক্ষেত্রে মূলত বিষ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্সেনিক্যাল কীটনাশকের নাম, তাদের ব্যবহার পদ্ধতি ও ব্যবহার দেওয়া হলো-

কীটনাশক	ব্যবহার পদ্ধতি	ব্যবহার
আর্সেনিক এসিড	৭৫ পরিমাণে ০.০০৩৫ ঘনমিটার/ হেক্টর	তুলা শুকানো
ক্যাকোডাইলিক এসিড	৩.৪-১১.২ কেজি/হেক্টর	বনের উন্মুক্ত স্থানের নবরূপ দান, শস্যহীন অঞ্চলের আগাছা নিয়ন্ত্রণ
ডাইসোডিয়াম মিথেলার্সোনেট	তুলা বের হওয়ার পর ২.৫২ কেজি/ হেক্টর; বনের খোলা স্থান ও শোভা বর্ধনে ২.২৪-৪.২৬ কেজি/ হেক্টর	তুলা ও শস্যহীন অঞ্চলে, ক্যাব ঘাস
মনোসোডিয়াম মিথেলার্সোনেট	তুলা উদ্ভিদের পর পরই ২.৫২ কেজি/ হেক্টর; বনের উন্মুক্ত স্থান ও শোভাবর্ধনে ২.২৪-৪.২৬ কেজি/ হেক্টর	তুলা ও শস্যহীন অঞ্চলে, ক্যাব ঘাস
ক্যালশিয়াম আর্সেনেট	১.৬৮-৩.৩৬ কেজি/হেক্টর ১০০ গ্যালন (০.৩৮ ঘনমিটার) জলতে মিশিয়ে বা ২.২৪-২৮ কেজি/হেক্টর ধূলিকণায় মিশিয়ে	তুলা কীটনাশক, ফল, শাক-সবজি ও আলু
লেড আর্সেনেট	৩.৩৬-৬৭.৩ কেজি/ হেক্টর বা ১.২-৭২ কেজি/ ঘনমিটার জলতে মিশিয়ে	ফল, শাক-সবজি, বাদাম ও তৃণভূমিতে
প্যারিস গ্রিন	১.১২-১৭.৯ কেজি/ হেক্টর	বঁড়শির টোপ, মশার লার্ভিসাইড
সোডিয়াম আর্সেনাইট	১.১২-১৭/৯ কেজি/ হেক্টর শুষ্ক টোপে মিশিয়ে	টোপ ও গবাদি পশুর খাদ্য, উদ্ভিদ ও দাঁতালো প্রাণী নিধক, শুষ্ককারক ও জলজ আগাছানাশক

এসব যৌগ কীটনাশক, আগাছানাশক, ছত্রাকনাশক ও শৈবালনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র ১৪ আর্সেনিকযুক্ত কীটনাশক

অন্যদিকে কাঠ সংরক্ষণ, ভেড়ার লোম পরিষ্কার, রং উৎপাদনের কাঁচামাল ও গবাদিপশুর ফিতাকৃমি বিনাশের জন্য আর্সেনিক্যাল ব্যবহার করা হয়।

ঘ. শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাচজাত দ্রব্য এবং কিছু কিছু ধাতব সংকরকে শক্তিশালী করার জন্য আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। প্রায় ১০০ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আর্সেনিক বা আর্সেনিকের বিভিন্ন রূপ নানা ধরনের শিল্প পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে কয়েক ধরনের শিল্প পণ্য উৎপাদনে আর্সেনিকের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো -

- রঞ্জক শিল্প (Paint Industries)
- কাঠ সংরক্ষণ শিল্প (Wood Preservation Industrieং)
- কীটনাশক উৎপাদন শিল্প (Insecticide Manufacturing Industries)
- ধাতব আকরিক উৎপাদন শিল্প (Metal Ore Production Industries)
- গ্লাস তৈরি (Glass Manufacturing Industries)
- ওষুধ শিল্প (Medicine Industries)
- লেড ব্যাটারি শিল্প (Lead Battery Industries) প্রভৃতি
- সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন শিল্প (Semiconducter Manufacturing Industries), যেমন গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (Gallium arsenide), ইন্ডিয়াম আর্সেনাইড (Indium arsenide) এলুমিনিয়াম আর্সেনাইড (Aluminium arsenide)।

ঙ. ইলেক্ট্রনিকস শিল্পে

কম্পিউটারে নানা ধরনের চিপ তৈরি করার কাজে অধুনা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (আর্সেনিক যৌগ) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান যুগে যেসব আর্সেনিক্যাল নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

বিভাগ	ব্যবহার
কৃষি	কীটনাশক, পত্রনাশক, কাঠ সংরক্ষণ, বাকল ছাড়ানো, মাটি নির্বীজক
পশুসম্পদ	ফিড এডিটিভ, পশু-পাখির রোগ প্রতিরোধক, গো-ভেড়ার খাদ্য, শৈবালনাশক।
ওষুধ	সিফিলিস,ট্রাইপানোসোমিয়াসিস, অ্যামিবিয়াসিস, নিদ্রা রোগ।
ইলেক্ট্রনিকস শিল্প	সৌরকোষ, অপ্টোইলেক্ট্রনিক যন্ত্র, সেমিকন্ডাক্টর, আলো নির্গমন ডায়োড। কাচের জিনিস, ইলেক্ট্রোফটোগ্রাফি, রঞ্জক, সাবান, সিরামিক, ওষুধ কারখানা।
ধাতুশিল্প	সংকর ধাতু, ব্যাটারি পেট ইত্যাদি।

আর্সেনিক যে শুধু প্রধান যৌগ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, তা কিন্তু নয়। অন্য আরো অনেকক্ষেত্রেই আর্সেনিক ব্যবহৃত হতে পারে। আর্সেনিকের বিভিন্ন প্রজাতি একক বা একাধিক প্রজাতির মিশ্রণে এসব কাজ করা হয়। এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আর্সেনিক মৌলের বিভিন্ন অজৈব ও জৈব যৌগের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

আর্সেনিক যৌগ	ব্যবহার
ধাতু আর্সেনিক	ধাতু সংকর, রং ঝালাই যন্ত্র, শিল্প-ব্যাটারির বিদ্যুৎবাহী ধাতুদ-, ইলেকট্রোফটোগ্রাফি
বিশুদ্ধ আর্সেনিক	সেমিকন্ডাক্টর, সৌরকোষ, ফটোইমিসিভ তল, অপ্টোইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ
ক্যাকোডাইলিক এসিড	গুল্মনাশক, তুলাগাছ নিষ্পত্রকরণ
ক্যালশিয়াম ও সীসা আর্সেনেট	ফলবাগানে কীটনাশক
ফিনেলার্সেনিক যৌগ	পশুখাদ্য সংযোজক রাসায়নিক, রোগ প্রতিরোধক
আর্সেনিক এসিড	নিষ্পত্রক বা শুষ্ককারক, কাঠ সংরক্ষণ লবণ, খাদ্য সংযোজক রাসায়নিক
সোডিয়াম আর্সেনাইট	বাকল ছাড়ানো, পশুপাখির রোগ প্রতিরোধক, গো-ভেড়ার খাদ্য ভেজানো, জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ, আলু গাছের নিষ্পত্রক।
আর্সেনিক-ট্রাই-অক্সাইড ও আর্সেনিক লবণ	তৃণনাশক ও মাটি নির্বীজক
বিশুদ্ধ আর্সেনিক-ট্রাই-অক্সাইড	বিবর্ণক, কাচ তৈরির জারণ-বিজারণ বাফার
আর্সেনিক পেন্টাঅক্সাইড	কাঠ সংরক্ষণ
এমরফাস আর্সেনিক-ট্রাই- সেলেনিয়েড	ইলেকট্রোগ্রাফি
গ্যালিয়াস আর্সেনাইট	সৌরকোষ, অপ্টোইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ আলো নির্গত ডায়োড।
প্যারিস গ্রিন	আপেল, চেরি ও অন্যান্য ফল ও শস্যক্ষেতে স্প্রে, মশক লার্ভানাশক, বঁড়শির টোপ।
আর্সেনিক সালফাইট	অতিহিমায়ন, লোমনাশক
টারসিয়ারি আর্সিন	অসম্পৃক্ত যৌগের পলিমারাইজেশন প্রভাবক বা সহপ্রভাবক।
এরোমেটিক আর্সেনো যৌগ	সিফিলিস প্রতিরোধক ওষুধ
মেলাসাপ্রোল এবং-ট্রাইপানসোমাইড	ট্রাইপানোসোমিয়সিসের চিকিৎসা
কার্বাসোন ও পাইকোবিয়ার্সোল	এমেবিয়োসিসের চিকিৎসা ও কালো মাথা টাক্রির রোগ প্রতিরোধক
আর্সেনিলিক এসিড	খাদ্য সংযোজক রাসায়নিক
আর্সোনিক এবং আর্সেনিক এসিড	উদ্ভিদনাশক, ছত্রাকনাশক, জীবাণুনাশক, মোটর গাড়ির জ্বালানি সংযোজক, ইস্পাত ক্ষয়রোধক।
রোক্সার্সোন (৩-নাইট্রো)	খাদ্য সংযোজক রাসায়নিক

যদিও আর্সেনিকের ব্যবহার সারা বিশ্বেই অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, তবুও এর ব্যবহার যে একেবারেই থেমে গেছে তা কিন্তু নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনও এই রাসায়নিক পদার্থটির ব্যবহার ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

তবে আর্সেনিক বিষয়ে কর্মরত বিজ্ঞানীদের ধারণা আর্সেনিক যদি যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবহার করা যায়, তবে হয়তো এর মরণ প্রভাব অনেকাংশেই হ্রাস পাবে এবং পরিবেশে এটি জৈবিকভাবে বিবর্ধিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিও যথেষ্ট কমে যাবে।

অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক, বাংলা একাডেমি
ঢাকা।

বহুল আলোচিত তিন মহাজাগতিক মহাকাব্যের তিন রূপকার

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ চিরকালের। যুগ যুগ ধরে তাই মহাবিশ্ব/মহাজগৎ নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার শেষ নেই। এই চিন্তারই প্রতিফলন স্টিভেন ওয়াইনবার্গের ১'দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস', জে এন ইসলামের 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' এবং স্টিফেন হকিং-এর 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম'-এর মতো বহুল আলোচিত তিন মহাজাগতিক মহাকাব্য। আমরা খুবই আনন্দিত ও গর্বিত যে এরূপ বহুল আলোচিত তিনটি গ্রন্থের মধ্যে একটির রচিয়তা হলেন বাঙালি জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানী ও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ববিদ জে এন ইসলাম, আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম।

'দ্য ফাস্ট থ্রি মিনিটস' গ্রন্থটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম তিন মিনিট এর ওপর ভিত্তি করে লেখা। গ্রন্থটি আন্দ্রে ডাচ লিঃ, গ্রেট ব্রিটেন থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে লেখক যে বর্ণনা তুলে ধরেছেন তা বস্তুত শুরু হয়েছে মহাবিস্ফোরণ অর্থাৎ বিগ ব্যাং-এর ০.০১ সেকেন্ডের পর থেকে। এর কারণ ওই সময়ের আগের যে সম্ভাব্য ঘটনাপ্রবাহ তার কিছু উল্লেখ থাকলেও বস্তুত সেই অতিঘনীভূত দশার নিয়মাবলী পরীক্ষালব্ধভাবে জানা সম্ভব হয়নি এখনো। তাই গ্রন্থের যে চমকপ্রদ গল্প তা চলছে মহাবিস্ফোরণের মুহূর্তের পর তিন মিনিট ছেচলিশ সেকেন্ড পর্যন্ত। স্টিফেন ওয়াইনবার্গ ১৯৩৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচিড ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি পাকিস্তানি পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালাম ও আমেরিকান আরেক পদার্থবিজ্ঞানী শেলডন গাসোর সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। জে এন ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলায়। ১৯৩৯ সালে। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইডডি ও ডি এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বেশ কয়েকটি উন্নতমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি গবেষণা ও শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। আর স্টিফেন হকিং জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪২ সালে। অক্সফোর্ডে। তিনিও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। বর্তমানে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের লুকেসিয়ান অধ্যাপক। এক সময় এই পদে নিউটন অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে এ পদে ছিলেন পি এ এম

ডিরাক। তাঁরা দুজনই অতিবৃহৎ ও অতিক্ষুদ্র নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। হকিং এঁদেরই একজন যোগ্য উত্তরসূরী। যদিও স্টিভেন ওয়াইনবাগ বিভিন্ন সময় বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কিছুটা গবেষণা করেছেন তারপরও মৌলিক কণিকার ওপর গবেষণারই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। তাই এ ব্যাপারে একটি গ্রন্থ রচনার প্রথম দিকে তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। পরে তিনি দেখলেন যে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনার চিন্তা ভাবনা থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতে পারছেন না। তাঁর নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল যে বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভিক মুহূর্তের সমস্যা বা ঘটনাবলীর চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক জিনিস আর কী-ই বা হতে পারে। এখান থেকেই লেখকের গ্রন্থটি লেখার সূত্রপাত। তবে একজন তাত্ত্বিক গবেষকের পক্ষে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখার জন্য সময় খুঁজে পাওয়ার দৃষ্টান্ত দুর্লভ এবং তার চেয়েও দুর্লভ ঘটনা হলো সেই লেখার মধ্যে দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠা। এ ক্ষেত্রে বলা যায় তিনজনই সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। যাহোক, স্টিভেন ওয়াইনবার্গ রচিত 'দ্য ফাস্ট থ্রি মিনিটস' গ্রন্থের সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে জে এন ইসলাম রচিত 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' (মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি) এবং ১৯৮৮ সালে স্টিফেন হকিং রচিত 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

জে এন ইসলাম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ১৯৭৭ সালে 'কোয়ার্টারলি জার্নাল অব দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটিতে আমি একটি নাতিদীর্ঘ বিশেষায়িত লেখা লিখি। যার শিরোনাম ছিল 'পসিবল আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স। আমার কয়েকজন সহকর্মী এই পেপারটিকে বেশ পছন্দ করলেন। ঠিক তখনই ওয়াইনবার্গের অসাধারণ গ্রন্থ 'দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' প্রকাশিত হয় এবং আমার মনে হলো মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ থাকলে বেশ হতো। এরপর শীঘ্রই জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ম্যাগাজিন 'স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ' থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয় আমি যেন পেপারটিকে সাধারণের পাঠযোগ্য করে লিখি। লেখার পর পেপারটি ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পেপারটি প্রকাশের পর বেশ সাড়াও পাওয়ো যায় তখনই আমার মনে হলো ওই বিষয়ের ওপর একটি সাধারণ গ্রন্থ থাকলে মন্দ হয় না। এরই ফলস্বরূপ বর্তমান গ্রন্থটি। গ্রন্থটি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে 'দ্য ফার্স্ট থ্রি মিনিটস' গ্রন্থের ঠিক ৬ বছর পর ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। এখানে কাকাতালীয়ভাবে দেখা যাচ্ছে ওয়াইনবার্গের জন্মেরও ঠিক ৬ বছর পরই আবার জে এন ইসলামের জন্ম। আর জে এন ইসলামের জন্মের ৩ বছর পর স্টিফেন হকিং-এর জন্ম। আমরা জানি, গ্যালিলিও'র মৃত্যু এবং নিউটনের জন্ম একই সালে (১৬৪২ খৃ.)। আবার ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যু এবং আইনস্টাইনের জন্মও একই সালে (১৮৭৯ খৃ.)। আর গ্যালিলিও'র মৃত্যুর ঠিক ৩০০ বছর পর হকিং-এর জন্ম। যিনি গ্যালিলিও, নিউটন ও আইনস্টাইনের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বলা যায়, এখানেই বিজ্ঞানের ধারাবাহিকতা। বিজ্ঞানের আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন কখনো আলাদীনের প্রদীপের মতো হঠাৎ করে একদিনে সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে রয়েছে অনেকের অবদান। নিউটন যেমন বলেছেন, If I have been able to see further than any one else this is because I have stood on the shoulders of

giants.(যদি আমি অন্যদের থেকে দূরে দেখতে পেয়ে থাকি, সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে আমি কতিপয় দৈত্যের কাঁধে চড়েছিলাম।) অধ্যাপক ইসলাম বলেছেন, 'নিউটন এখানে যেসব দৈত্যের কথা ভেবেছিলেন তাঁদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তবে ধারণা করা হয় তাঁরা হলেন আর্কিমিডিস, কোপার্নিকাস, টাইকো ব্রাহে, গ্যালিলিও ও কেপলার।' অধ্যাপক ইসলাম রচিত 'দ্যা আল্টিমেট ফেইট অব দ্যা ইউনিভার্স' গ্রন্থটি প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

Jamal Islam describes the modern consmologists view of the cosmic crystal ball with vigour, succinetness and directness. -New Scientist

As this grand scenario for cosmic evolution is developed, Islam carefully expains the interplay between particle physics and cosmilogy, ... (reading the book) is well worth the effort. The reward is a rare revelation: the unveiling of the unimaginably remote furture of the universe. –Nature

The crisp clarity of the text is a model of scientific communication, and the volume is complemented by a good glossary... This concise yet remarkably comprehensive volume is written in a clear readable style which should be assessible to any reader with only the most tenuous background in astronomy and physics. It is strongly recommended to anyone with an interest in this exotic but compelling subject. -Journal of the British Astronomical Association

এখানে উল্লেখ্য, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ইসলামই প্রথম জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পূর্বে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মহাবিশ্বের সূচনা অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভিক মুহূর্তের ঘটনাবলীর ওপর ভিত্তি করেই রচনা করেন গ্রন্থ। কিন্তু বিশ্বের নিয়তি অথবা পরিণতি কী হতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি (অধ্যাপক ইসলাম) প্রথমে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পরে গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

শরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী
জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম- ৪৩৩১।